রনবীর কার্টুনে বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতি

(দুই দশকের সমীক্ষা ১৯৬০-১৯৮০)

এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ

২০০১

400454

সাদিয়া আফরোজ

Dhaka University Institutional Repository

M.Phil.

GIFT

400454

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

রনবীর কার্টুনে বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতি

(দুই দশকের সমীক্ষা ১৯৬০-১৯৮০)

এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ

২০০১

400454

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ কে, এম, মোহসীন
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

গবেষক

সাদিয়া আফরোজ
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নম্বর

ভূমিকা I

প্রথম অধ্যায়ঃ

১. কার্টুনের ভাষাঃ আদি ও বর্তমান ১

২. শিল্পীদের সমাজ-সচেতনতা ভিত্তিক শিল্পকর্ম ৮

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

১. ষাটের দশকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র (১৯৬০-১৯৭১) ১২

২. সত্তরের দশকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র ২৪

৩. মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমস্যা ৩৪

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

১. রনবীর কার্টুনের বিষয়বস্তু ৫৮

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

১. কার্টুনে প্রতিফলিত সমাজ ও অর্থনৈতিক চিত্র (স্বাধীনতা পূর্বকাল) ৯৫

২. কার্টুনে প্রতিফলিত সমাজ ও অর্থনৈতিক চিত্র (স্বাধীনতাত্তোর দশক) ১১২

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

১. রনবীর কার্টুনের সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব ১৪৩

উপসংহার ১৪৫

গ্রন্থপঞ্জী ১৬৩

400454

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

একজন কার্টুনিষ্টের চোখে আমরা বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির চিত্র অবলোকন করব এবং উপলব্ধি করব দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ সমাজ ও রাজনীতি সচেতন একজন চিত্র শিল্পীর তুলিতে কিভাবে একটা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়।

যার কার্টুনকে ধারণ করে আমরা এ প্রতিবেদন তৈরীতে প্রয়াসী হয়েছি তিনি সবার পরিচিত কার্টুনিষ্ট "রনবী"। পুরো নাম রফিকুন নবী। মূলতঃ একজন চিত্রশিল্পী (Painter)। ষাটের দশকের প্রথম দিকে যখন তিনি কার্টুন চর্চা শুরু করেন তখন রাজনৈতিক কারণে তাঁকে মূল নাম থেকে সংক্ষিপ্ত করে "রনবী" নামটি ছদ্মনাম হিসেবে ব্যবহার করতে হয়েছিল। এখন রনবী নামটিই সবার কাছে বেশী পরিচিত এবং বিশেষ করে "টোকাই" স্রষ্টা হিসেবে এ নামটি আরও বেশী জনপ্রিয় ও সমাদৃত। পেশা হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন শিক্ষকতা। ১৯৬৪ সাল থেকে এই সুদীর্ঘ সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট ইনষ্টিটিউটে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

রনবী প্রভাবশালী সমাজকর্তা বিংবা জাঁদরেল অর্থনীতিবিদের কোন পদে অধিষ্ঠিত নন। তিনি মূলতঃ শিল্পী। কিন্তু তবুও আমরা তাঁর কাছ থেকে বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবগত হব। তাঁর হৃদয় নিংড়ানো রং তুলির আঁচড়ে সৃষ্ট কার্টুনের ইঙ্গিতময় ভাষাকে বুঝতে চেষ্টা করব। একজন শিল্পীর গভীর মননশীলতা ও সূক্ষজ্ঞান বোধের সুদীপ্ত আলোকে সমাজ ও অর্থনীতিকে মূল্যায়ন করব।

একজন চিত্র শিল্পীর কাছ থেকে চাওয়া পাওয়ার এ প্রয়াস কতটা যুক্তিযুক্ত এবং কতটা যথার্থ সে প্রসঙ্গে সম্ভাব্যতা যাচাই করার ক্ষেত্রে আমরা ইতিহাসের কিছুটা পিছনে চলে যেতে পারি। আদিম যুগের মানুষ অন্ধকার গুহা থেকে বেরিয়ে যেদিন মৃত্তিকার নিচে লুকিয়ে থাকা মহামূল্যবান রত্ন ভান্ডারের রহস্য উদঘাটনে আত্মনিয়োগ করে, পৃথিবীর প্রতিকূল পরিবেশকে বশে আনার এবং ঐ পরিবেশে টিকে থাকার কৌশল যেদিন তারা আয়ত্ব করতে উদ্যোগী হয় এবং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রের রহস্য আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করে, প্রকৃতপক্ষে সেদিন থেকে আধুনিক সভ্যতার যাত্রা শুরু। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, তারও পূর্বে এই গুহাবাসী মানুষেরাই চিত্রকলার মাধ্যমে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক মনস্কতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। তারা তাদের হৃদয়ের কল্পনা, শৈল্পিক অনুভূতি, রসবোধ এবং অলৌকিক বিশ্বাস ও বোধের দ্বারা তাড়িত হয়ে গুহাগাত্রে যে চিত্র সম্ভার রেখে গেছে সেগুলোকে আজও মানুষ বিস্ময়ের সাথে স্মরণ করে থাকে। শুধু তাই নয় গোটা মনুষ্য জাতির বোধ বুদ্ধি অঙ্কন-গড়নের যে করণ কৌশল তার শুরুও এই শিল্প কলাকে কেন্দ্র করে। তাই এই চিত্রশিল্প মানব জীবনের অস্তিত্ব ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে মূল্যবান অভিজ্ঞানের মৌলিক পরিচায়ক হিসেবে নিঃসন্দেহে বিবেচনার দাবী রাখে।

রনবীর কার্টুনে জীবন ও সমাজবোধের যে আলোকবর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে তাতে আমরা ব্যক্তি ও গোষ্ঠী উভয় ক্ষেত্রে আলোকিত হতে পারব এ প্রত্যাশা রেখে কার্টুনের পরিচয়, পরিধি, প্রভাব, কার্যকারিতা ও আধুনিক বিশ্বে এর প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা নিতে চাই।

কার্টুন বা ব্যংগচিত্র ছবি আঁকার ক্ষেত্রে হাজারো ধরনের একটি ধরন। হাজারো রকমফেরের একটি হলো এই ব্যঙ্গ করার জন্য আঁকা এক ধরনের চিত্র যার নাম দাঁড়িয়েছে 'কার্টুন'। ব্যঙ্গ আর শ্লেষাত্মক চিন্তার শিল্পিত রূপায়ন। আনন্দের রসপূর্ণ আর ক্ষোভের নান্দনিক প্রকাশভঙ্গী। কার্টুন যুগযন্ত্রণাকে রেখার মাধ্যমে চিত্রকল্পে পরিণত করে। নন্দনতত্ত্বের একটি ভিন্ন আংগিকে নতুন একটি ধারার সংযোজন করেছে এই অংকন রীতি। নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে কয়েকশ বছর ধরে এর বিস্তৃসঙ্কুল অভিযাত্রায় বিভিন্ন দেশের লোকজ চরিত্র, সমাজরীতি, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিধৃত হয়েছে। অঙ্কিত হয়েছে এই চিত্র মাধ্যমে। আজ এর এত জনপ্রিয়তা, সহজ আকর্ষণীয় ব্যঙ্গরসাত্মক নান্দনিক ভঙ্গীর কারণে। কার্টুনে হাসাবার ব্যাপারে এক ধরনের পরিচ্ছন্নতা এবং বক্তব্য পেশে প্রচ্ছন্নতার আশ্রয় নিতে হয়, যা কিছুতেই ভাঁড়দের হাসানোর মত কাতুকুতু হয়ে ওঠে না। এই পর্বটিই কার্টুনের বৈশিষ্ট্য। অতএব কার্টুনে হাসাবার অস্ত্রটি ভিন্ন।

সভ্যতার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে বিংশ শতাব্দীর বিকাশ আর উন্নতির কথা। এই ব্যাপারটিই আসলে আজকের কার্টুনের প্রধান বিষয়। বিজ্ঞান এগিয়েছে ঠিকই কিন্তু মানুষ তাল মিলাতে পারছেনা বিজ্ঞানের দ্রুতগতির সাথে। সারা পৃথিবী জুড়ে যান্ত্রিকতা মানুষকে যন্ত্র করে ফেলেছে। তার ফলশ্রুতিতে হাসিটি একেবার উবে যাবার উপক্রম হয়েছে। মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

মনুষ্যবোধকে রক্ষণ করার ও টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে শিল্পকলার মত কার্টুনও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

কার্টুন মানে সব কার্টুন না-সেসব অবশ্যই সামাজিক রাজনৈতিক অথবা এডিটোরিয়াল কার্টুন। নিছক আনন্দ দেয়ার জন্যও কার্টুন আছে, কমিক ষ্ট্রিপ, এ্যানিমেশন ফিল্ম, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি। কার্টুন সচেতন চিন্তার বলিষ্ঠ রূপায়নের মাধ্যমে সমাজ অর্থনীতি ও রাজনৈতিক পরিবেশকে করতে পারে অনুভূতিপ্রবণ। আমাদের কার্টুন আঁকার গোড়াপত্তন বৃটিশ ভারতে। সারা পৃথিবীতে কার্টুন বিহীন পত্র-পত্রিকা এখন আর কল্পনাই করা যায় না। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় আজও মাধ্যমটি তেমন ভাবে ঠাঁই পায়নি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি কারণই হয়তো এর জন্য দায়ী। এমন পরিস্থিতির ভিতর আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তথা সাধারণ মানুষের জীবন যন্ত্রণা কার্টুনের মাধ্যমে সংবাদ পত্র পাঠকের দৃষ্টিতে তুলে ধরার জন্য কেউ কেউ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। রনবী তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে অন্যতম।

একথা বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না যে, শিল্পী 'রনবী' কার্টুনকে পাঠকের কাছে জনপ্রিয় করেছেন। আজ সংবাদপত্র বা সাময়িকী পাঠকদের কাছে কার্টুনের যে চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে তার পিছনে রনবীর একক অবদান অনেক খানি। তিনি তাঁর কার্টুনের মধ্য দিয়ে'টোকাই' সৃষ্টি করেছেন। এটা আজ শুধু পত্রিকা পাঠকের কাছেই নয় সামাজিক ভাবে স্বীকৃত। এটা নিশ্চয় সমাজচিত্রের একটি আবিষ্কার। রনবী তাঁর কার্টুনের মাধ্যমে বিত্তহীন ঠিকানাহীন শোষিত শ্রেনীর প্রতিনিধি 'টোকাই' এর যন্ত্রণা ক্ষোভ ও চাহিদাকে ভাষা দিয়েছেন। তাঁর এই অবদান শিল্পকলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সমাজ ও সভ্যতার মূল উপাদান হল মানুষ। আর মানুষ তার স্থিতি ও ব্যাপ্তির জন্য বাস্তবে সবচেয়ে বেশী নির্ভরশীল থাকে সমাজও অর্থের উপর। সমাজ ও পরিবারের আশ্রয়েই ব্যক্তিসত্তা পরিস্ফুটিত হয়। অর্থ সেখানে এক অপরিহার্য উপাদান। জীবন ও অর্থের সম্পর্ক নদী ও জলের মত। জলহীন নদী যেমন গতিহীন, অর্থ ব্যতিরেকে জীবন তেমনি অচল ও নিষ্ফল। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মূল প্রতিপাদ্য দিক হল সমাজ ও অর্থনীতি। সমাজ জীবনে অর্থনীতির কার্যকারিতা জীবনের ক্ষেত্রে মৌলিক অপরিহার্য বিষয় হিসাবে গণ্য

Dhaka University Institutional Repository

করা যায়। আর সে অর্থে এ বিষয়টিকে আমি প্রাত্যাহিক চলমান জীবনে ব্যক্তি, সমাজ তথা জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আলোচ্য সূচী হিসেবে বেছে নিয়েছি। জীবনের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে ও এ বিষয়টি বিশেষ জরুরী ও কার্যকর। সত্যিকার অর্থে সমাজ ও অর্থনীতি আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ প্রসঙ্গে সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণার প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই এসে পড়ে।

সমাজ হল মানুষের সম্পর্ক ব্যবস্থার ধারক। যার ভিতর মানুষ বসবাস করে। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ব্যতীত সে নিঃসঙ্গভাবে বাঁচতে পারে না। সমাজেই সে জন্মগ্রহণ করে এবং লালিত পালিত হয়, ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ লাভ করে, সর্বোপরি তার জীবন অতিবাহিত করে।

মানবজীবনের অসংখ্য অভাব পূরণের জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন তা সীমিত হওয়ায় মানুষকে বিভিন্ন কর্মপন্থা বা পর্যায় গ্রহণ করতে হয়। অভাব মিটিয়ে মানুষ নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করে তা থেকেই অর্থনীতির জন্ম। অর্থনীতি সমাজে বসবাসরত রক্তমাংসে গড়া মানুষের সাধারণ কার্যাবলী আলোচনা করে যা দ্বারা সমাজে নানাবিধ প্রভাব সৃষ্টি হয়। সমাজ কাঠামোর উপর অর্থনীতির ক্রিয়া ও বিক্রিয়ার দ্বারা সমাজ উপকৃত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ১৯৬০-১৯৮০ সাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। আলোচ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে কমবেশী পূর্বাপর ঘটনার প্রেক্ষিতের ক্ষেত্রে এ সময় ও কাল বিশেষ মূল্য রাখে। এসব ঘটনার মধ্যে ভাষা-আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর উল্লেখযোগ্য ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৮-৬৯ এর গন অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭৪ সালের অর্থনৈতিক সংকট, ১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থান।

১৭৫৭ সালে ইংরেজরা এদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে। তারপর বিভিন্ন কারণে সময়ে এ দেশের মানুষের মনে জন্ম নিয়েছে বিক্ষোভ, আন্দোলন আর সংগ্রামের। ফলে ১৯৪৭ সালে জন্ম নিয়েছে ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব মিলে পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী বৈষম্যের পাহাড় সৃষ্টি করেছিল সর্বক্ষেত্রে ফলে স্বাধীন হলেও পূর্ব বঙ্গের মানুষ

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারে নি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর কারণে। তারা নানা ভাবে শোষণ শাসন, নির্যাতন চালিয়ে নিষ্পেষিত করেছে এ অঞ্চলের জনগণকে। সর্বক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার হারিয়ে জনমনে যে পুঞ্জিভূত বিক্ষোভ জমা হয়েছিল তাই অধিকার আদায়ের আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলন বাঙালীর ইতিহাসে এক মাইল ফলক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর চরম পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতির স্বাধীকার আন্দোলন ও জাতীয় চেতনায় বিজয় ঘোষিত হয়। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী শুরুতেই বাঙালীদের উপর উর্দূভাষা চাপিয়ে দিয়ে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার দাবীতে ১৯৫২ সালে এক ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলন তাদের নব জাতীয় চেতনা তথা ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবোধর উন্মেষ ঘটায়। বাঙালীরা এই প্রথমবার তাদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্রতা তথা স্বাধীকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে। তাদের মধ্যে স্বাধিকার অর্জনের তীব্র আকাঙ্খা জাগ্রত হয়। ভাষা আন্দোলন এর ফলে বাঙালীদের জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটে।

১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের ফলে বাঙালী জাতীয়তাবোধ ক্রমশ জোরদার হয়। এ নির্বাচনে কেন্দ্রের বিমাতাসুলভ শাসনের প্রতি বাঙালীদের বিরোধীতার প্রকাশ ঘটে। তারা তাদের স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীকারের দাবীর প্রতি ঐক্যবদ্ধভাবে সমর্থন জানায়। এ নির্বাচনের ফলে বাঙালীরা তাদের ঐক্যের গুরুত্ব ও শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে।

বাঙালীরা নিজেদের উন্নতি যাতে নিজেরাই সাধন করতে পারে সে লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবী পেশ করা হয়। এসব দাবী বাঙালীদের কাছে 'মুক্তি সনদ' বলে মনে হয়। এ আন্দোলন বাঙালীদেরকে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা যোগায়।

এগার দফা দাবীতে পরিচালিত ১৯৬৮-৬৯ গণআন্দোলন বাঙালীদের জাতীয় চেতনাকে আরো সংগ্রামী করে। এগার দফাতে পূর্ববাংলার স্বায়ত্বশাসনের দাবী ছাড়াও ছাত্র-কৃষক শ্রমিকের দাবী অর্ন্তভুক্ত ছিল। ফলে সব শ্রেনীর বাঙালীরা এ আন্দোলনে শরীক হয়। এ আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতিতে

Dhaka University Institutional Repository

আইয়ুব সরকারের পতন ঘটলে বাঙালীরা তাদের আত্মশক্তিতে আরো আস্থাশীল হয়ে উঠে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালীরা তাদের স্বায়ত্বশাসনের দাবীর প্রতি প্রশ্নাতীত সমর্থন দান করে। তাই বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকাশে এ নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই নির্বাচনে পূর্ববাংলার মানুষ একচেটিয়াভাবে ভোট দিয়ে প্রমাণ করে যে, তারা পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়তে চায়। এই নির্বাচনে বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালীদের জাতীয় সংহতি আরো দৃঢ় হয়। কিন্তু কুচক্রি সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়। ফলে জনসাধারণের মনে অসন্তোষের আগুন দানা বেঁধে স্বাধীকার আন্দোলনে রুপ নেয় । আন্দোলন দমন করতে ইয়াহিয়া সরকার পৃথিবীর ইতিহাসে ঘৃণ্য ও জঘন্যতম গণহত্যা সংগঠিত করে। এর পর স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পর থেকে সারা দেশে মুক্তি পাগল ছাত্র জনতা স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় প্রতিরোধ আর স্বাধীনতা যুদ্ধ। এভাবে কয়েক মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে বাঙালী জাতি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

স্বাধীনতার পর দেখা গেল মানুষ অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে যেমনটি আশা করেছিল তার কোনটিই বাস্তবায়িত হচ্ছে না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের যথার্থ প্রতিফলন হলো না। ১৯৭৪ সালে দেখা যায় প্রবল বন্যা এবং দেশে জরুরী আইন ঘোষনা করা হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি সরকারের প্রবর্তন করা হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে ১৫ই আগষ্টে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান সপরিবারে নিহত হন। তারপর ঐ সালেরই শেষার্ধে দেশের সামরিক শাসন জারি হয়। ফলে সংবিধান অকার্যকর হয়ে পড়ে।

এরপর ১৯৭৮ সালে পুনরায় কতিপয় সংশোধনীসহ সংবিধান বলবৎ করা হয় এবং দেশ ব্যাপি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । কিন্তু পুনরায় ১৯৮২ সালে সংবিধান নিষ্ক্রিয় করে সামরিক শাসন জারি হয়। এমনি ভাবে এই দুই দশকের ভিতর স্বাধীনতা অর্জনসহ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে সর্বস্তরের মানুষের ভিতর পরিবর্তনের ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সেসব অনুভবের

Dhaka University Institutional Repository

সূক্ষ্মবোধ, অনুরণন ও প্রতিচ্ছবি আমরা সমসাময়িক শিল্পীদের লেখনীতে, তুলিতে এবং বিশেষ করে রনবীর কার্টুনে স্পষ্টই দেখতে পাই। তাই আমরা আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের গতিধারা, অবক্ষয়, সম্ভাবনা ইত্যাদি বিচার বিশ্লেষনের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৮০ সাল এই দুই দশকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছি।

উক্ত গবেষণা কর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যদিও আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচেছ প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী রনবীর কার্টুন থেকে বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির পরিচয় প্রাপ্তি। কিন্তু কার্টুন যেহেতু এখানে মূল মাধ্যম তাই প্রাসঙ্গিক ভাবে আলোচ্য গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে কার্টুন কি? এবং কেন? আদি কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কার্টুনের ভাষা উৎপত্তি ও আবেদন ইত্যাদি নিয়ে কথা বলা হয়েছে। খুব সংক্ষিপ্ততার মধ্যেও একটি দেশের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ কার্টুনের মাধ্যমে তুলে ধরা যায় সে বৈশিষ্টতার বর্ণনা এতে রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রভাবশালী পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বেশ কজন সমাজ সচেতন প্রখ্যাত চিত্র শিল্পীদের শিল্পকর্মের আলোচনা এখানে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বাধীনতাপূর্ব ঘাট থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত তৎকালীন পাকিস্তানীদের সেই বৃটিশদের ঘৃণ্য পথ অনুসরণ করে নবতর ঔপনিবেশিক শাসনের প্রবর্তন ও নব্য বুর্জোয়া শ্রেনীর আবির্ভাব ঘটিয়ে মূখ্যত শাসনের নামে পূর্ব বঙ্গকে শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত করার বর্ণনা রয়েছে। তাদের শোষণ ও নির্যাতনের ফলশ্রুতিতে পরিণামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির বৃত্তান্ত এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সত্যিকার অর্থে অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে যে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে সেসব কারণও সমস্যাগুলি পৃথকভাবে এই অধ্যায়ের শেষাংশে চিহ্নিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে রনবীর কার্টুনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা। নির্দিষ্ট কিছু কাঠামোর উপর ভিত্তি করে ছকের সাহায্যে তাঁর কার্টুনকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিশেষ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলোকে আবার বিভিন্ন বিষয় থেকে খন্ডিত করে তার যথাযথ বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর কার্টুনের প্রভাব এখানে বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পর্বে স্বাধীনতা পূর্ব কালের সমাজ ও অর্থনীতির হাল চাল সহ রনবী তাঁর কার্টুনে যেভাবে শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি সম্পর্কে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর পরিচালিত বৈষম্যমূলক কার্যাবলী তুলে ধরেছেন তার সুস্পষ্ট ও সবিস্তার বণর্না করা হয়েছে। ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে আমরা আবার তাঁর কার্টুনে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সফলতা ও ব্যর্থতার চড়াই উৎরাই এর বিভিন্ন চিত্র দেখতে পাই।

সমাজের বৃহত্তম অংশ যখন ন্যুনতম মৌলিক চাহিদা পুরণে অক্ষম হয় তখন বিবেকবানদের বিবেকে সত্যিকার অর্থে রক্ত ক্ষরণ হয়। আর সেই ক্ষরিত রক্তের ছাপ রনবীর কার্টুনে প্রতিভাত হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের ক্রান্তিকালে দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যকে তিনি কখনো পাশ কাটিয়ে যাননি। পঞ্চম অধ্যায়ে রনবীর কার্টুনের গুরুত্ব বিচারের বণর্নায় আমরা সেখানে সেই প্রয়োজনীয় ও সময় উপযোগী সংকেত মূলক মেসেজটির অনুরণন শুনতে পাই।

রনবীর কার্টুনে বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতি (১৯৬০-১৯৮০) শিরোনামে অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক গবেষণার ফল; বাংলাদেশের সমাজও অর্থনীতিকে রনবীর কার্টুনের মাধ্যমে আলোকপাত করাই এ গবেষণার মূল লক্ষ্য।

এই অভিসন্দর্ভ পত্র রচনার জন্য প্রথমে আমি যাঁর কাছে সার্বিক ভাবে কৃতজ্ঞ তিনি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ডঃ কে. এম. মোহসীন। তাঁর নির্দেশনা, উপদেশ ও অনুপ্রেরণা না পেলে আমার পক্ষে এ কঠিন কাজ সুষ্ঠু ভাবে সমাপ্ত করা কোন মতেই সম্ভবপর হতো না।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিখ্যাত কার্টুনিস্ট রনবীর কাছে। যাঁর কার্টুন নিয়ে আমার গবেষণা কর্ম। তিনি তাঁর অনুভবের অংশীদার, মূল্যবান সময়, উপদেশ ও উৎসাহ দানে আমাকে এ গবেষণা পত্রটি প্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

যাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা আমাকে এই কাজে সফলতা লাভে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তাদের মধ্যে আমার বড় ভাই-বোন, ভগ্নিপতি, ভাগ্নে-ভাগিনীর নাম বিশেষ ভাবে স্মর্তব্য। এছাড়া কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু

Dhaka University Institutional Repository

করে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেছে আমার ভাই সাইফ। এদের জানাই আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

এ গবেষণা কর্মে যাঁদের সংস্পর্শে আমাকে আসতে হয়েছে তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হয়তো কোন কালে সম্পন্ন করতে পারবনা। তাছাড়া অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন পর্বের সঠিক বিন্যাস, ভাষাশৈলী, বর্ণনা কৌশল ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমার সীমিত জ্ঞান ও অপরিপক্ক হাতের অপারগতা আমাকে নিরন্তর জবাবদিহীতার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রাখবে। শুভানুধ্যায়ীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা নিয়েও আমি হয়তো ত্রুটিমুক্ত হতে পারিনি। তাই এ অনিচ্ছাকৃত ভুলের দায়ভার একান্ত আমার।

পরিশেষে, যাদের দোয়া ও আশীর্বাদে এমন একটি দুরুহ কাজ সম্পাদন করতে পেরেছি সেই বাবা-মার অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করে কৃতজ্ঞতা পর্বের সমাপ্তি টানছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

কার্টুনের ভাষা ঃ আদি এবং বর্তমান

কার্টুন কি এবং কেন? এ জিজ্ঞাসা এখন আর পাঠকদের অজানা নেই। বহুল ব্যবহৃত হবার কারণে বিষয়টি সম্পর্কে সকলেই কম বেশী অবহিত। এতে রাজনীতি থাকবে, সামাজিক নানা বিষয় ঠাট্টা, কটাক্ষ এবং প্রচ্ছন্নে নানা কিছুকে ভৎর্সনা থাকবে। প্রয়োজনে ভাল কিছুর জন্যে প্রশংসা এবং সব কিছুকে একটা ছোট্ট গন্ডীর মধ্যে কার্টুনিস্ট তার নিজস্ব পদ্ধতিতে ব্যঙ্গাত্মক ড্রইং আর প্রয়োজনে রসিকতামূলক শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করে পাঠকদের পরিবেশন করেন মোটামুটি এই হলো কার্টুন।

সবার প্রিয় এবং বহুল জনপ্রিয় শিল্পের এই মাধ্যম কার্টুন কিন্তু শুরু থেকে এরকম সার্বজনীনতা পায়নি। কার্টুনকে শিল্প বলার সবচেয়ে যুক্তিসংগত এবং প্রধান কারণ হচ্ছে অন্যান্য শিল্পের মত কার্টুনও আমাদের সামনে কোন বিষয়কে নিয়ে রসবোধ, তীক্ষ্ণতা, চিন্তার গভীরতা এবং প্রচ্ছন্ন উপস্থাপনা এ সবকটি বিষয় তুলে ধরে। যাই হোক কার্টুন শব্দটি এসেছে "ক্যারিকেচার" শব্দ থেকে। এটি ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীয় শিল্পী আনাবেল কায়াচিচর প্রবর্তিত "কারিকাতুরা"[২] শব্দের একটি অপভ্রংশ। ১৬৪৬ সালে মোসিনি বলেন, " সংক্ষেপে ক্যারিকেচার হচ্ছে বিশুদ্ধ বিকৃতি পারফেক্ট ডিফরমিটি। বস্তু বা প্রকৃতি যা মানুষের ডিসফিগারমেন্টের[২] শিল্প"। শুরুতে এই শিল্পের উপর বহুকাল ধরে আধিপত্য বিস্তার করছিল ইতালীয়রাই। আঠারো শতাব্দীর শুরুতে সারা ইউরোপ ইতালী ক্যারিকেচার তথা ব্যঙ্গাত্মক চিত্রকর্মের সর্বাত্মক প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসেছে।

কার্টুনের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে আধুনিক কার্টুনিস্টরা অবশ্যই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবেন উইলিয়াম হোগার্থ এর নাম। তাঁর সময়ে কোন ছাপাখানা বা সংবাদপত্র ছিল না। ছবি আঁকা হতোপোষ্টারে বা বোর্ডে, তামার পাত বা কাঠ খোদাই-এ। তারপর বাজারের মাঝখানে সেটি সাজিয়ে রাখা

---

১. In graphic art, comically distorted drawing art likeness, done with the purpose of satirizing or ridiculing its subject, whether it be a person, type, or action.-Encyclopeadia Britanica.

২. Disfigure থেকে disfigurement কথাটি এসেছে। এর আক্ষরিক অর্থ অঙ্গবিকৃতি। কোন কিছুকে হুবহু সেরকম না এঁকে কিছুটা বিকৃতির মাধ্যমে তার অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে চিহ্নিত করার শিল্প। [সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন "ছুটির দিনে"-১৩ তম সংখ্যা]

Dhaka University Institutional Repository

হতো। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত লন্ডনের "পাঞ্চ"[৩] পত্রিকায় কাঠ খোদাই করে কার্টুন ছাপা হতো। উনিশ শতকের দিকে কার্টুন হয়ে উঠে ফাইন আর্টসের সমকক্ষ। আর এই দেয়াল ভেঙে ফেলতে যে শিল্পীর নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তিনি হচ্ছেন দোমিয়েরয়া। উন্নাসিক ফাইল আর্টিস্টদের চরম আঘাত করার মত ড্রইং ছিল তাঁর । অপরদিকে ভেভিড লো, ফ্র্যাংগোনার্দ, ম্যালে, রাওল্যান্ডসনের মত এমন অনেক আঁকিয়ে ছিলেন যারা কখনোই প্রটেস্ক বা চেহারা বিকৃতি না করে যে যেমন দেখতে ঠিক তেমনই এঁকেছেন। বলা যায় এঁরাই ব্যঙ্গচিত্রের প্রথম সার্থক শিল্পী। এইসব শিল্পীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কার্টুনের প্রতি ভালবাসার মাধ্যমে শুরু হয় কার্টুনের জয়যাত্রা যা আজ আরো জনপ্রিয় এবং শৈল্পিক উৎকর্ষে উন্নীত হয়েছে।

ইদানীং পত্র-পত্রিকার জন্যে কার্টুন একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলা চলে। সারা বিশ্বে তো বটেই আমাদের দেশেও। একটি কার্টুন কাগজের যে কোন পৃষ্ঠায়ই হোক, না থাকলে কাগজটিকে অসম্পূর্ণ মনে হয়। বিশেষ করে যদি বিশটি পত্রিকার উনিশটিতে কার্টুন থাকে তবে যেটিতে নেই সেটির অন্যান্য দিকে পাঠক আকৃষ্ট হলেও এই একটি দিকের অভাব বোধ করেন। কারণ এই একটি জিনিস আকারে খুব ক্ষুদ্র হলেও এর বক্তব্য এবং উপস্থাপনা পাঠককে তাৎক্ষণিক আনন্দিত করে, ভাবায়, হাসায় এমনকি কখনো কখনো গম্ভীরও করে বটে। ভীষণ ভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে দিতে পারে কোন না কোন দিকের ভাল-মন্দ এবং ঠাট্টা দিয়ে। ছেপে যাওয়া কার্টুনটি দেখে পাঠ করে রসগ্রহণ করে এবং এর ভাল-মন্দ বিচার করতে মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের প্রয়োজন হয়। এরপর পাঠকের চোখ সরে যায় কাগজের অন্যান্য কলামে। তবে ভাল আর রসগ্রাহী হলে কার্টুনটির রেশ থেকে যায় মনে। কখনও বিশেষ বিষয়টির প্রসঙ্গ আসলেই সেটি অর্থাৎ কার্টুনটির কথা স্মরণে এসে যায় সর্বাগ্রে। প্রয়োজনে আলোচ্য বিষয়ও হয়ে উঠে। কথিত আছে এবং অনেকেই কার্টুন সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে একটি কথা উল্লেখ করেন যে কার্টুন খুব

---

৩. এযাবত কাল কার্টুনের উপর প্রকাশিত ব্যঙ্গ প্রত্রিকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়। ১৮৪৯ সালে দ্য লন্ডন কারিভারি নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। [সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন "ছুটির দিনে"- ১৩ তম সংখ্যা।]

Dhaka University Institutional Repository

ছোট পরিসরের হলে ও সংক্ষিপ্ততার মধ্য দিয়ে অনেক বড় কথা বলে। রীতিমত বিশাল করে লেখা কোন নিবন্ধ বা সম্পাদকীয়ের চাইতে বেশী ফলপ্রসু এবং বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে লাগসই ভূমিকা রাখে।

কথাটি হয়তো ঠিক। কারণ এই শতাব্দীর বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহ এবং রাজনৈতিক বা সামাজিক কিছু ঘটনায় কার্টুনকে বড় ধরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের নজীর রয়েছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথাই ধরা যাক। বিলাতের পত্র-পত্রিকা যুদ্ধ নিয়ে, যুদ্ধের দৈনন্দিন ঘটনাবলীকে নিয়ে লেখালেখির পাশাপাশি কার্টুনকে প্রাধান্য দিয়েছিল। এসময়ে উল্লেখযোগ্য কার্টুনিস্ট হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ডেভিড লো। তাঁর কার্টুনের ক্ষুরধার বক্তব্য আর রসিকতা শত্রু-মিত্র সবার কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। জার্মান সেনা-নায়ক এবং রাজনীতিবিদদের কাছে তো রীতিমত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল তাঁর কার্টুন। কারণ তাঁর কার্টুনে তিনি চার্চিলের যুদ্ধ পরিচালনার ভুল-ত্রুটিগুলো রসিকতার মাধ্যমে সমালোচনা করতেন। তাতে বৃটিশ সরকার সেগুলি শুধরে নেয়ার সুযোগ পেতেন। অতএব ব্যাপারটি হিটলার এবং তাঁর সহকর্মীদের ভাবিয়ে তুলতো।

যুদ্ধোত্তর সময়ে ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উন্নয়ন এবং সবকিছুকে পুনস্থিতিশীল করতে সব দেশকেই বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দেয়া কঠিন হয়ে উঠছিলো। এসময় বৃটিশ কার্টুনিষ্ট ভিকি-র কার্টুন গণ্য হত রাজনীতিবিদদের কাছে নিজেদের নীতিগুলোকে শুধরে নেয়ার ব্যাপারে।

রাজনৈতিক ব্যাপারেই শুধু নয়, যুদ্ধের সময় সৈন্য এবং সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত রাখতেও কার্টুনের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। নরম্যান পেট নামের একজন স্ট্রিপ কার্টুনিষ্ট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সৃষ্টি করেছিলেন 'জেন' নামের একটি চরিত্র। চরিত্রটি প্রায় কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছেছিল। 'ডেইলী মিরর'-এ নিয়মিত ছাপা হতো। যুদ্ধ নিয়ে নানান রসিকতা থাকতো। হাসির সব ব্যাপার ঘটানো হতো প্রতি দৃশ্যে। গল্পে জেনকে দেখা যেতো কখনো শহরে নিজ পরিচিত জনদের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে তর্ক-বিতর্কে আবার কখনো একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা সেনা ছাউনীতে। এমন সব ঘটনায় জড়িয়ে পড়তো জেন এবং এমনসব হাসির উদ্রেক করতো যে, সত্যিকারের যুদ্ধক্ষেত্রে যার প্রাণ হতে নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধে ব্যস্ত তাঁরা সেসব পড়ে ও দেখে যুদ্ধক্ষেত্রের সব বিড়ম্বনা ভয়-ভীতি ভুলে গিয়ে উজ্জীবিত বোধ করতেন। ভল্‌টেয়ার ও রুশোর ক্ষুরধার এবং জ্বালাময়ী লেখনীর অনুপ্রেরণার মতই অনুপ্রেরণা লাভ করতো। 'জেন'- এর জনপ্রিয়তা বৃটেন ছাড়িয়ে সারা বিশ্বের মিত্র দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার শুরু বলতে গেলে ১৯৪৭ থেকে। '৪৭ থেকে '৭১ ছিলো এই অস্থিরতার প্রথম অধ্যায়। বিদেশীদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়াই ছিলো তখন প্রধান লক্ষ্য। পাকিস্তানের পশ্চিমা শাসকদের রক্তচক্ষু প্রদর্শন ছিল তখনকার নিয়মিত ঘটনা। যে কোন আন্দোলনকে প্রতিহত করতে অথবা দানা বাঁধতে না দেয়ার জন্যে নানাবিধ রাজনৈতিক কৌশল এবং শক্তি প্রয়োগ ছিলো তাদের মজ্জাগত। বাক্‌স্বাধীনতাকে এ অংশে খর্ব করে রাখার প্রচেষ্টা ছিলো এসব কৌশলের অন্যতম। সুতরাং পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি ব্যাপারটিতে খোলাখুলি সমালোচনা কখনই সহজ হয়নি।

কার্টুন মূলতঃ সমালোচনাকেন্দ্রিক। সমাজ, সংসার, রাজনীতি সহ দেশের নানান দিকের যেসব অসংগতি বিরাজমান থাকে তার সমালোচনাই হলো কার্টুনের মূখ্য কাজ। কিন্তু পাকিস্তানীদের কঠিন নজর এড়িয়ে কিছু লেখাও যেমন তখন প্রায় অসম্ভব ছিল তেমনি আঁকাও। এসব কারণে কার্টুনের প্রচলন তখন জোরালো হতে পারে নি। বিশেষ করে সরাসরি রাজনৈতিক বা সোসিও-পলিটিক্যাল কার্টুন। খুবই প্রচ্ছন্ন কিছু বক্তব্য রেখে হয়তো মাঝে মধ্যে কোন কোন কাগজ এবং শিল্পী দুঃসাহসী হয়ে উঠতেন কিন্তু তা নিতান্তই অনিয়মিত। তবে তখন অর্থাৎ পুরো পাকিস্তানী আমলে বিভিন্ন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মিছিল মিটিং এ ব্যবহারের জন্যে কার্টুন আঁকা হতো এবং এতে দেশের প্রায় সব শিল্পীই কার্টুন আঁকায় নিয়োজিত হতেন স্বেচ্ছায়। এভাবেই জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান থেকে শুরু করে তাঁদের ছাত্র যেমন রফিকুন নবী যিনি 'রনবী' নামেই অধিক পরিচিত এবং হাশেম খান 'ছবি খান', সিরাজুল হক 'সায়দা' নামে কোন না কোন সময় কার্টুন এঁকেছেন।

তবে মাসিক এবং ত্রৈমাসিক বেশ কিছু পত্রিকায় তখন রাজনীতিবর্জিত 'গ্যাগ' বা পকেট কার্টুন ছাপা হতো। সচিত্র সন্ধানী ছিল এদের মধ্যে অন্যতম। বলতে গেলে স্বাধীনতার পরই বাংলাদেশে কার্টুনের মূল চর্চা এবং প্রকৃত রাজনীতি সচেতন কার্টুনের প্রসার ঘটে। পত্র-পত্রিকাও ক্রমশ

Dhaka University Institutional Repository

কার্টুনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এবং যথারীতি আজ অবধি তা অক্ষুন্ন আছে। শুধু তাই নয় কার্টুন প্রায় সব পত্রিকাতেই স্থান পাচ্ছে।

স্বাধীনতার পর দেশকে পুনর্গঠনের এবং নতুন করে উন্নয়ন পরিকল্পনার ভুল-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার প্রয়োজন আসে। নতুন প্রেক্ষিতে ব্যাপারটি খুব সহজ হয়না । কারণ আত্মসমালোচনা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। তা ছাড়া যুদ্ধে বিধ্বস্ত প্রায় দেশের সবকিছু অর্থাৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্র নীতি থেকে শুরু করে দেশের আচার-সংস্কৃতি, চালচলন, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হয়েছে সবাইকে নতুন করে গড়বার জন্যে। পাকিস্তানী পঁচিশ বছরে যে নানাদিকে 'পলিউশন' তাকে ধুঁয়ে মুছে শুদ্ধ করে তোলার আয়োজন শুরু করতে হয় তাৎক্ষনিক ভাবেই। অতএব যুদ্ধোত্তর বিড়ম্বনাগুলিকে অতিক্রম না করে কঠোর সমালোচনায় যাওয়ার ব্যাপারটিও হয়তো তখন কোন ক্ষেত্রেই তেমন প্রয়াস ছিল না। তবে সামাজিক যেসব গরমিল ক্রমশ দানা বাঁধছিল সেগুলিকে নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখা হচ্ছিল। কিছু নতুন পত্রিকাও আত্মপ্রকাশ করছিলো। সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা' তাদের অন্যতম। এসময় বিচিত্রা এবং দৈনিক বাংলা ব্যাপকভাবে কার্টুন ব্যবহারের নিয়মটি চালু করতে পেরেছিল। এসব কার্টুন ছিল মূলত সোসিও-পলিটিক্যাল ।

কার্টুন এ সময়কালে এতোটা জনপ্রিয় হয় যে, আশির দশকের শুরুতেই দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কার্টুন পত্রিকা 'উন্মাদ' এবং 'কার্টুন' তরুণ কার্টুনিস্টদের সহায়তায় রীতিমতন সাড়া জাগিয়ে তোলে। আশির দশকের শেষ এবং নব্বইয়ের শুরুর দিকে অসংখ্য পত্র-পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এসবের প্রচ্ছদে সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্যে কার্টুন মুদ্রিত হয়। 'যায় যায় দিন' তাদের অন্যতম। বর্তমান সময়ে 'চলতিপত্র' পত্রিকাটিও উল্লেখযোগ্য। সাপ্তাহিক বিচিত্রা এই সব কটি দশকে রাজনৈতিক এবং 'সোসিও-পলিটিক্যাল' কার্টুন ব্যবহার অব্যাহত রাখে। বলাবাহুল্য প্রচ্ছদে প্রায়শই রাজনৈতিক কার্টুন ব্যবহার বিচিত্রার প্রায় অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সমালোচনায় অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলো সাপ্তাহিক বিচিত্রা প্রায় এককভাবে।

Dhaka University Institutional Repository

কার্টুন আঁকার চল এবং পত্রিকায় তা ব্যবহারের প্রচলন বৃদ্ধি পেতে বিলম্ব হলেও আমাদের দেশে এর প্রয়োজনীয়তা বিদেশের মতই সকলে উপলব্ধি করতে পেরেছে সেটাই বড় কথা। বিদেশের সাথে এ নিয়ে এবং কার্টুনের মান নিয়ে তুলনা করার সময় হয়তো এখনো আসেনি কিন্তু আমাদের দেশের প্রয়োজনীয়তাটুকু মিটছে এটাও কম কথা নয়। তাছাড়া শুধু কার্টুন আঁকিয়েই নয়, কার্টুনকে উপলব্ধি করার, বোঝার, এর রসগ্রহণ করার মত পাঠকও বেড়েছে।

বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের সাথে সাথে শিল্পকলার অনেক পরিবর্তন এসেছে। প্রায়শই বিজ্ঞানকে উপজীব্য করেও শিল্পকলার ধরণ-ধারণ পাল্টেছে। যেমন মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের সাথে সাথে কাগজের উন্নতি হয়েছে। কাগজের উন্নতির সাথে পত্রিকা প্রকাশের সুবিধে বেড়েছে। পত্রিকার সাথে যুক্ত হয়েছে চিত্র ব্যবহারের। আদিতে ধাতবপাতে আঁচর কেটে বা খোদাই করে ছবির ব্লক তৈরী করে ছাপার প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে। শিল্পীরা সেসব চিত্রকে ভিন্ন স্বাদ আর মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যঙ্গ চিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। আঠারো শতকের পুরোটাই এই নতুন দিকটিতে শিল্পীদের আকৃষ্ট থাকতে দেখা যায়। বিশেষ করে ফ্রান্স এবং বৃটেনে।

ফরাসী বিপ্লবকে কেন্দ্র করে সামাজিক এবং রাজনৈতিক যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাতে শিল্পীরা ছাপাচিত্রের সমস্ত কিছুকে ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে রসিকতা করার দিকে ঝুঁকে যান। বলাবাহুল্য রাজনৈতিক কর্মীরাই এসবে উদ্বুদ্ধ করতো এবং ঘরে বসে সেসব কথা প্রচারের জন্যে ছাপচিত্রকে কাজে লাগাতো। মজার ঘটনা হলো যে, ফরাসীদের সমস্যা নিয়ে ফরাসী জনগণের পক্ষে সবচাইতে সার্থক সব চিত্র রচিত হতো ইংরেজ শিল্পীদের হাতে। ব্যাপারটি আগ্রহের সাথে গৃহীত হতো ফরাসীদের কাছে। এ ধরণের ব্যাপার অবশ্য এখন এই যুগে আমাদের মত দেশগুলিতেও চলে। অর্থাৎ দেশের অভ্যন্তরে দেশের অনেক কথাই জানা যায় না। বিদেশী পত্র-পত্রিকা বা রেডিও টিভিতে বরং বেশী থাকে।

ফরাসী বিপ্লবের সময় ফরাসীদের নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র আঁকতে গিয়ে ইংরেজ শিল্পীরা এ ব্যাপারে দক্ষ হয়ে গিয়েছিলেন। ফরাসীদের কাছে তখন ব্যঙ্গচিত্র মানেই ইংরেজরা দক্ষ এমন ভাবা হতো। এ ব্যাপারে একজন ফরাসী

Dhaka University Institutional Repository

বিদগ্ধজন বলেছিলন, " Caricature is the English Art.". এবং তিনি "রাওল্যান্ডসন এবং জেমস গিলারি"[৪] কে সে সময়ের শ্রেষ্ঠতম ব্যঙ্গচিত্রী হিসেবে গণ্য করেছিলেন। ব্যঙ্গচিত্র সে সময় এমন ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ করে এক ধরণের আদরণীয় পর্যায়ে পৌঁছুতে পেরেছিল। এসব ধারা থেকে উৎসারিত হতে হতে ব্যঙ্গচিত্র এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে আধুনিক বিশ্বের সর্বত্র। এখন সারাবিশ্বে অসংখ্য কার্টুনিষ্ট। অতি বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় কার্টুনিষ্টের সংখ্যাও কম নয়। যেমন-কার্টুনিষ্ট হিসেবে অতি পরিচিত ভুরী একজন।

একটা দিক জিজ্ঞাসা থেকেই যায় তা হলো চিত্রকে ব্যঙ্গাত্মক করা যায় বা স্বাভাবিক বাস্তব ড্রইংকে ভেঙ্গে একজাজারেট করে ওই ধরনের আঁকা যায় এমন ধারনাটা এলো কি করে। মানুষ জীবজন্তু ইত্যাদি থেকে শুরু করে সবকিছুকে স্বাভাবিকত্বের বাইরে এক ধরণের মনগড়া চেহারা এবং অবয়ব আঁকার বুদ্ধি মানুষ পেল কোথা থেকে।

ব্যাপারটা হঠাৎ করে আসেনি। আঁকা-জোকার ব্যাপারে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছানোর পরই শিল্পীরা এসব দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। গ্রীকরা প্রাচীন কালে ব্যঙ্গাত্মক এবং হাস্যরসাত্মক চরিত্রের কারণে মুখোশ তৈরী করতো নাটকের জন্যে। তাঁর খসড়া ড্রইং করতে হতো। পরবর্তীতে রেনেসাঁর সর্বকালের সেরা শিল্পী লিওনার্দো-দ্যা-ভিঞ্চি ক্যারিকেচার ড্রইং এর উপর অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। সেগুলি এখনও কালজয়ী ড্রইং হিসেবে পরিগণিত।

অতএব পরে কালে কালে ব্যাপারটিতে শিল্পীদের আগ্রহ বেড়েছে এবং আঁকার শৈলীতে পরীক্ষা নিরীক্ষাসহ কি করে এসবকে কাজে লাগানো যায় একাধারে রসগ্রাহী করতে এবং মানুষের কল্যাণের জন্যে তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে আর কাজ করতে করতে বর্তমান পর্যায়ে একটা চমৎকার অবস্থানে অধিষ্ঠিত করতে পেরেছে। এখন এটা একক সাফল্যের ব্যাপার নয়। এর সাফল্যের দাবীদার তিন ক্ষেত্রে মানুষ-শিল্পী, প্রকাশক এবং পাঠক। শিল্পী আঁকলে, প্রকাশক তা ছাপলে এবং পাঠক তা পাঠ করে বা দেখে রসগ্রহণ করলে তবেই একেকটা কার্টুন সফল- সার্থক।

৪. দুজন সার্থক ইংরেজ ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী যাদের আঁকার ধরণ এবং বক্তব্য প্রকাশের দ্বারা ফরাসী শিল্পীরা প্রভাবিত হতো। [রনবীর বক্তব্য থেকে উদ্ধৃত]

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পীদের সমাজ-সচেনতা ভিত্তিক শিল্পকর্ম

'একহাজার শব্দের চেয়ে একজন শিল্পীর তুলির ক্ষমতা অনেক বেশী'। এই প্রবাদ বাক্যটি যে সমাজের অবস্থান দেখানোর এবং প্রেক্ষাপট বদলানোর ক্ষেত্রে কতটা বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা সম্ভবত বাংলাদেশেই প্রথম উপলব্ধি করা যায় ১৯৭১ সালে কামরুল হাসানের বদৌলতে। তিনি 'ভীমরুল' নামে কার্টুন চর্চা করেছেন। তুলির অনুপম আঁচড়ে কুখ্যাত ইয়াহিয়ার দানব মূর্তিটি তুলে ধরে তাঁর আঁকা " এই জানোয়ারকে হত্যা করতে হবে"- শীর্ষক পোস্টারটি। এটি তখন উজ্জীবিত হতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল সর্বস্তরের মানুষের কাছে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাঁর আঁকা "দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে" ও একই ভাবে আলোড়ন তুলেছিল। এভাবেই সবসময় চারপাশের সামাজিক তথা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মানবীয় পরিমন্ডল শিল্পীর তুলির খোঁচায় বের হয়ে এসেছে। আর হবেই বা না কেন, শিল্পী তার কাজের আগ্রহ আর আয়োজনটাতো পায় সমাজ থেকেই।

বাংলাদেশে শিল্পচর্চাকে আমরা দু-ভাগে ভাগ করতে পারি। স্বাধীনতা পূর্বকাল ও স্বাধীনতাত্তোর কাল। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের আলোচনা স্বাধীনতার পূর্ববর্তী অবস্থাকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাবে। এ উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে সমাজের নানা অসংগতি কিংবা সংগতিও তুলে ধরা হয় মূলত: ইংরেজদের প্রস্থানের ঠিক আগের মুহূর্ত থেকে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। সেসময় গগেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরা যুগপৎ স্বাধীনতা আন্দোলনকারী এবং ইংরেজদের উপর ব্যঙ্গার্থক চিত্র এঁকে আক্রমণ শানিয়েছিলেন। যা ছিল সেসময় ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের সাথে পুরোপুরি যুক্তিসংগত। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের পর তিনি যে কাজটি করেছিলেন সেটি ছিল রীতিমত দুঃসাহসিক। বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে এসে তৎকালীন বড়লাট দেখলেন-নরকঙ্কাল আর নরমুন্ডে আকীর্ণ জালিয়ানওয়ালাবাগের মাঠ। মড়া খুলির পাহাড়ে আধাশায়িত হয়ে আছেন ইংরেজ শাসক ও'ডায়ার। নীচে ক্যাপশন--

"peace declares in the Punjab."

Dhaka University Institutional Repository

ঠিক তেমনি ভাবেই গান্ধীজির প্রতিশ্রুতি মতন যখন স্বাধীনতা এলো না তখন তাঁকে উদ্দেশ্য করে গগেন্দ্রনাথ[৫] ঠাকুর কার্টুন এঁকে নীচে ক্যাপশন লিখেছিলেন-

" Often a hen who had merely laid an egg cackles as if she had laid an asteroids."

[কখনো একটা মুরগী স্রেফ একটি ডিম পেড়ে এমন ভাব করে যেন একটা গ্রহই পেড়ে ফেলেছে]

এরপর আগমন ঘটে যতীন কুমার সেন, চায়ুরানদের মত বিখ্যাত কার্টুনিস্টদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র প্রফুল্ল চন্দ্র লাহিড়ী তিনি পি. সি.এল নামেই বেশী পরিচিত ছিলেন। কার্টুনের ক্ষেত্রে তিনি আন্তর্জাতিক মান ছুঁয়েছিলেন। পিসিএলই প্রথম এদেশে চালু করেন স্ট্রিপ কার্টুন, কাফিস্কোপ বা বিজ্ঞাপনে কার্টুনের ব্যবহার।

চল্লিশের দশকের গোঁড়ার দিকে যুদ্ধ নিয়ে কার্টুন এঁকেছিলেন প্রথম মুসলমান কার্টুনিস্ট কাজী আবুল কাশেম দো-পেঁয়াজা নাম নিয়ে। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠার দাবী চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে ১৯৫৩ সালে সৈনিক পত্রিকায় ছাপা হয় তাঁর সেই কার্টুনটি। এতে দেখানো হয়েছিল যে একদল পাকিস্তানী শাসক ধারাল অস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশীদের তাড়া করছে আর হতচকিত সেই মানুষগুলোর সাথে তাদের বর্ণমালাও ছুটে চলে যাচেছ। এসব কার্টুন প্রকাশ করা সব সময় নিরাপদ ছিল তা নয়। কিন্তু তারপরও শিল্পীরা থেমে থাকেননি। আর সে কারণেই মানুষ স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছিল অনেক গুণ বেশী।

আধুনিক চিত্রকলায় অগ্রদূত হিসাবে আদৃত জয়নুল আবেদিন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন শিল্পের সম্পদ নিয়ে আমাদেরকে যতটা আকর্ষণ করেন তার চেয়েও বেশী আকর্ষণ করেন বোধ হয়- শিল্পচর্চায় নির্যাতিত, নিপীড়িত ও বিপর্যস্ত মানুষের জন্যে সহানুভূতি যোজনা করে । তিনি তুলি হাতে নিয়েছিলেন মানুষের মানবেতর পরিস্থিতিকে আমাদের বিবেকের কাছে

---

৫. উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের একজন সফল কার্টুনিস্ট যিনি শুদ্ধ ক্যারিকেচার ড্রইং এবং তাতে ব্যঙ্গ কথার অভিপ্রায় নিয়ে কার্টুনধর্মী ছবি আঁকার প্রয়াস পেয়েছিলেন। বলা যায় ভারতবর্ষের তিনি প্রথম আধুনিক ক্যারিকেচারিস্ট যিনি সমাজ, সমাজ ব্যবস্থা, রাজনীতি ইত্যাদির ভুলত্রুটি নিয়ে ব্যঙ্গ করায় চেষ্টা করেছেন।[শহীদুল হক সম্পাদিত 'নিরীক্ষা' অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৫ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-২৬]

Dhaka University Institutional Repository

শাণিত করে তুলতে। শুধু মানুষের কথাই নয় প্রাণীর দুঃখ কষ্টকেও ধারণ করেছিলেন তাঁর তুলিতে। খাদে পড়ে যাওয়া কাঠ বোঝাই গরুর গাড়ির ছবিটি নিয়ে জয়নুলের নিজস্ব বক্তব্য ছিল "দেখেছ ছবিটা? গরুর চোখ দিয়ে প্রায় রক্ত বেরিয়ে আসছে কষ্টে"। এক গভীর অনুভব, সীমাহীন বেদনাবোধ আছে কথাগুলোর মধ্যে। জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ- তা মানুষের বা প্রাণীরই হোক- জয়নুলকে শিল্পের একাডেমিক রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্রণোদিত করেছিল এবং তার ফলেই তাঁর ছবিতে জীবন ও শিল্প যেন সমীকৃত।

আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধকে জয়নুল আবেদিনের ছবিতে আমরা প্রত্যক্ষ করি। '৭০ এ তিনি এঁকেছিলেন অস্ত্র কাঁধে চাদরে মুখ আবৃত তীর্যক চোখের চাহনী। মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরতা ও নৃশংস হত্যাযজ্ঞের কথা মনে করিয়ে দেয় তাঁর আঁকা শরণার্থী ছবিটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষের আগ দিয়ে দূর্ভিক্ষে যখন প্রচুর মানুষ অসহায় অবস্থায় না খেয়ে প্রাণ হারাচ্ছিল, তার সঠিক চিত্রায়ণ করেছিলেন জয়নুল আবেদীন। তাঁর "ম্যাডোনা" শীর্ষক অংকনটি সহায় সম্বলহীন মানুষের ঘর ছেড়ে শহরাভিমুখে যাবার পরবর্তী না খেয়ে রাস্তার ধারে পড়ে থাকার দৃশ্যকে তুলে ধরে।

ইংরেজদের চলে যাবার পরে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যগুলো পরবর্তী শিল্পীগণের মডেল হিসেবে আবির্ভূত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্বকালের বিভিন্ন গণ আন্দোলনগুলোর চিত্র এসময় তুলে ধরতে থাকেন জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান থেকে শুরু করে তাঁদের ছাত্রফুলের সবাই। সেসময় বিশেষ করে ষাট এর দশকের মিছিল মিটিং এর ফেস্টুন ও পোষ্টারে আন্দোলনের মুখপাত্র স্বরুপ প্রচুর চিত্রকর্ম করা হয়েছে। আর এসব চিত্রকর্মীদের অধিকাংশই ছিলেন চারুকলার তরুণ ছাত্র শিল্পীরা।

স্বাধীনতা পূর্বকালে আন্দোলন ছাড়াও মানুষের নানা রকম অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন এরকম শিল্পীরা হলেন কাইয়ুম চৌধুরী, মিজানুর রহমান, সুভাষ দত্ত, কালাম মাহমুদ, মোস্তফা জামিল, আজিজ প্রমুখ। এঁরা ঊনসত্তর এবং সত্তরের কিছু রাজনৈতিক চিত্র তুলে ধরা ছাড়া বাকি সব ছবি এঁকেছেন রসবোধ এবং অন্যান্য সামাজিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন চিত্রকর্ম কিংবা পাক সরকারের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গার্থক

Dhaka University Institutional Repository

কার্টুনগুলো পাকিস্তানী রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে পূর্বদেশ, চিত্রালী, সচিত্র সন্ধানী ইত্যাদি পত্রিকা ছাপাতো।

ষাটের দশকে সামাজিক কার্টুনে দুজন শিল্পী প্রায়শই তাদের কার্টুন নিয়ে পত্রিকায় উপস্থিত হতেন। এঁরা হলেন মীজান এবং জামীর। ষাট দশকের শুরুতে 'মীতাজী' নামে একই ধরণের কার্টুন এঁকেছেন এখনকার চিত্র পরিচালক সুভাষদত্ত। কালাম মাহমুদ কখনো কালাম, কখনো মাহমুদ এবং কখনো তিতু বা বীরবল নামে, কাইয়ুম চৌধুরী "কা-চৌ" নামে সচিত্র সন্ধানীতে কার্টুন চর্চা করেছেন। ষাট দশকের শিল্পী হাশেম খান 'ছবি-খান' নামে এবং সিরাজুল ইসলাম 'সায়দা' নামে কার্টুন এঁকেছেন। সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে কার্টুনিস্ট অনুপের কার্টুন 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকায় একটি অপরিহার্য অংগ হিসেবে তৈরী হয়েছিল। নজরুল বিচিত্রায় সরাসরি রাজনৈতিক কার্টুন এঁকে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। শিশির রাজনৈতিক নানা ঘটনাকে নিয়ে বিদ্রূপ আক্রমন করেন। শিশির ভট্টাচার্যের জনসভায় বক্তৃতারত প্লেগ আতংক নিয়ে করা সেই বিখ্যাত ইঁদুর কার্টুনটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ঘিরে ও তারপর দেশ পুনর্গঠণ এবং নানা অসংগতি নিয়ে যারা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে রনবী ছাড়া উল্লেখযোগ্য ছিলেন নজরুল, শিশির ভট্টাচার্য, আহসান হাবীব, শামীম চৌধুরী ও আরো কয়েকজন।

সত্যিকার অর্থে শিল্পীরা অনেকটা ছোট আঙ্গিকে পুরো সমাজ ব্যবস্থাকে তুলে ধরেন। আজ থেকে হাজার বছর আগে করা চিত্রকর্ম কিংবা মর্মর মূর্তি, ভাস্কর্য দেখে যেমন আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের চিন্তা-ভাবনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক অবস্থা বুঝতে পারি। তেমনি এখনকার আমাদের অতিপরিচিত বর্তমানকেও শিল্পীরা তাদের তুলির আঁচড়ে আমাদের আরেকবার চিনিয়ে দেয় স্বল্প পরিসরে। মাটিতে পড়ে থাকা কাঁচের টুকরো কিংবা পানির বিন্দু যেমন পুরো আকাশকে ধারণ করে। তেমনি শিল্পীরা তাদের শিল্প দিয়ে সমাজকে আবদ্ধ করে বাঙময় প্রাণহীন চিত্রে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ষাটের দশকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র

(১৯৬০-১৯৭১ পর্যন্ত)

যেকোন দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ইতিহাসের ধারায় বিবর্তিত হয়। সে কারণে বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির ধরণ তার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পর্যায়ে বিবেচিত। আলোচ্য বিষয়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা হয়েছে: স্বাধীনতা পূর্ব ('৬০-৭১') এবং স্বাধীনতাত্তোর সত্তর দশক পর্যন্ত।

ভৌগলিক দিক থেকে বর্তমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি অবিভক্ত বাংলার বৃহত্তর অংশ এবং উহা পৃথিবীর বৃহত্তর বদ্বীপগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশ একটি নদীবহুল দেশ। পদ্মা, মেঘনা, গঙ্গা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র বিধৌত বাংলাদেশ প্রচুর পলিমাটিতে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের ব্যাপক সমতল অঞ্চল জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বাঙালী জনগোষ্ঠীর লোকজন। বাংলাদেশ তথা বাঙালী নামের পিছনে নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগলিক উপাদান কাজ করেছে। যেমন, প্রথম একটি কৌম গোষ্ঠীর নাম হিসাবে 'বঙ্গ' পরিচিত ছিল, যা পরে আঞ্চলিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত পক্ষে বর্তমান বাংলাদেশে তথা পূর্ব বঙ্গই হচ্ছে 'বঙ্গ' কৌমের মূল আবাসভূমি। 'আইনী আকবরী'র লেখক আবুল ফজলের মতে 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে 'আল (পূর্ববঙ্গীয় আইল) যুক্ত হয়ে 'বাংলা' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। (কৃষির জন্য বৃষ্টির পানি খুবই প্রয়োজন। আর তা ধরে রাখার জন্য আইলের [বাঁধ] আবশ্যক। তাই কৃষি প্রধান বাংলাদেশের ক্ষেত খামারে অসংখ্য আইলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়)। বাংলাদেশ পাকিস্তান আমলে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এক ভিন্ন ধরনের ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে ছিল। ঐ সময় পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর একটি পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছিল শাসকবর্গের মূল লক্ষ্য। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলাদেশে যে সামাজিক অবস্থা বিকাশ লাভ করে তা পাকিস্তান আমলে এক নবতর রূপ পরিগ্রহ করে। বাংলাদেশের সমাজ জীবনে মুদ্রা

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতির পরিপূর্ণ প্রভাব পড়ার পূর্বে সেখানকার সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা জটিল আকার ধারণ করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মুদ্রা অর্থনীতি ও ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি পূর্ব বাংলার সমাজে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে। এর ফলে সনাতন বংশ মর্যাদা ভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরে। অর্থাৎ বংশ কৌলিন্যের পরিবর্তে বিত্তকৌলিণ্যের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। সমাজের বিত্তবান ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে সম্মানের অধিকারী হতে থাকে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজ নতুন ব্যবসায়ী মহাজন শ্রেনী ও বিভিন্ন পেশাদারী এক শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেনী আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত, পাকিস্তান আমলে পূবর্বাংলার সমগ্র সমাজ কাঠামো এক নতুন রুপ ধারণ করে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ব্যাপকহারে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ, ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক জমিদারী অধিগ্রহণ, নগরায়ন, পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতিমালা, আইউব খাঁর আমলে তথাকথিত 'বুনিয়াদী গণতন্ত্র' ও উহার আনুষঙ্গিক ওয়ার্কস প্রোগ্রাম প্রবর্তন ইত্যাদির প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থার ওপর পড়ে। হিন্দু উচচ জাতিবর্ণভুক্ত ভূ-সম্পত্তির মালিক, পেশাজীবি, ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা ভারত বিভক্তির কারণে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় চলে যাওয়ায় পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়, যা বাঙালী মুসলিম সমাজ থেকে উদ্ভূত উচচ ও মধ্যবিত্ত শ্রেনীর লোকের দ্বারা পূরণ হয়।

বাংলাদেশের বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেনী মূলত কৃষক সমাজ থেকে উদ্ভূত। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যার আবির্ভাব শুরু হয় তা চল্লিশের দশকে পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মলাভের সময় একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। এরা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্পদশালী হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের কারণে গ্রামাঞ্চলে মুসলিম জোতদার ও ধনী কৃষক আরো ক্ষমতাবান হয়। শহরাঞ্চলে উঠতি বাঙালী মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীর প্রভাবশালী অংশ শহুরে সম্পত্তি, ব্যবসা ও শিল্পের মালিক হয়। এভাবে ধন-সম্পদের হস্তান্তরের ফলে বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোয় নতুন শ্রেনীর সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত জমিদারী অধিগ্রহণের মাধ্যমে একদিকে অসংখ্য জমিদারের পরিবর্তে সরকার স্বয়ং সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদারে পরিণত হন, আর অন্যদিকে বাঙালী মুসলিম সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর্ভূক্ত ভূমির মালিকানা সম্পন্ন মধ্যস্তরের লোকেরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। এরা সমাজ জীবনে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ পান। সরকার মধ্যস্বত্ব ভোগী জমিদার, মিরাসদার ও তালুকদারের স্থান দখল করায় জমির খাজনা আদায়কারী তহশীলদারের উদ্ভব ঘটে। উক্ত জমিদারী অধিগ্রহণে মধ্যস্বত্ব ভোগীরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও গ্রামের জোতদার ও ধনীকৃষকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাদের সঙ্গে শহুরে সরকারি আমলা কর্মচারী ও ব্যবসায়ীর একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সৃষ্টি হয়। সরকার কর্তৃক মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারদের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করায় বৃহত্তর গরীব কৃষক, ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং বলা চলে, ১৯৫০ সালের প্রজাস্বত্ব আইনে এদের অধিকার সংরক্ষনের কোনো বিধান না থাকায় এদের আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। এর ফলে পূর্ববাংলার কৃষক সমাজে গরীব ও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক শ্রেনীর নব্য ধনীর হাতে শহর ও গ্রামাঞ্চলের ধন-সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। আর পুঁজিবাদী অর্থনীতির পরিমন্ডলে এরূপ উপস্থিতি এড়ানো প্রায় অসম্ভব। যদিও জমিদারী অধিগ্রহণের আইনে উদ্ধারকৃত "খাস জমি" গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টনের কথা ছিল, তবুও তৎকালীন সরকারের দ্বারা এটা বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। মোটকথা ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে জমিদারী প্রথা বিলোপের কোন ইতিবাচক প্রভাব সমাজের ব্যাপক অংশের ওপর পড়েনি। কারণ মালিকানা ব্যবস্থার মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয়নি। কেবলমাত্র জমিতে অসংখ্য মধ্যস্বত্বের পরিবর্তে সর্বোচচ পর্যায়ে একক রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কৃষক সমিতির দাবী অনুসারে মধ্যস্বত্বভোগীদের অধীনস্থ জমিতে কৃষকদের মালিকানা স্বত্ব স্বীকৃত হয়নি। এতে শুধু পূর্ববাংলায় সমাজে ক্রমশ শ্রেনীবৈষম্য বৃদ্ধি পাওয়ার পথ সুগম হয়। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের সম্ভাবনা ছিল পূর্বাঞ্চলে বেশী। বাঁধ বা সেচ-প্রনালীর সাহায্য ছাড়াই দুটি এমনকি তিনটি ফসল ফলানোর জল-সম্পদ ছিল এখানে। কিন্তু সরকারের শোষণ নীতির ফলে কৃষি ক্ষেত্রেও হার হলো। কৃষি ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হলো পশ্চিম পাকিস্তানের।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববাংলায় নগরায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হওয়ায় এর আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে ব্যবসায় ও শিল্পের বিকাশ ঘটে। শহরাঞ্চলে লোকসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। তুলনামূলক ভাবে শহরে কর্ম সংস্থানের সুযোগ থাকার কারণে গ্রামের গরিব ও মেহনতী মানুষ দলে দলে শহরে আসতে থাকে, এদের বসবাসের জন্য গড়ে উঠে বস্তি। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ভারত থেকে আগত অবাঙালী মুসলিম ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা বাঙালী সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলার সমাজে বুর্জোয়া হিসেবে পরিগণিত হয়। এছাড়া, ভারতীয় অবাঙালী মুসলিম উদ্বাস্তুদের ভেতর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমজীবি মানুষ ছিল, যারা পূর্ববাংলার বিভিন্ন কলকারখানা ও শিল্পে নিয়োজিত হয়।

নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় বাঙালী মুসলিম সমাজেও একটি শহুরে পেশাদারী ও ব্যবসায়ী শ্রেনীর জন্ম হয়। বস্তুত ১৯৪৭ সালের পর পূর্ববাংলায় শহুরে সমাজ সম্প্রসারিত হওয়ায় বাংলাদেশের গোটা সমাজ কাঠামোয় এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। এটি বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকায় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে মোগল আমলের শহর ঢাকার সামন্ত অভিজাত শ্রেনীর আধিপত্য অনেকটা খর্ব হয়। ঢাকার শহুরে সমাজে ক্ষমতার ভারসাম্য বাঙালী মুসলিম সমাজ থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন পেশাদারী উচচ মধ্যবিত্ত ও ব্যবসায়ী শ্রেনীর অনুকূলে চলে যায়। এদের ওপর বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব ন্যস্ত হয়,অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের পরিবর্তে সমাজে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলার সমাজে নগরায়ণের আর একটি উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য হচেছ এখানে শহুরে মুসলিম সমাজে "শরীফ" ও "শরীফ নয়" শ্রেনীর ভেতর সনাতন সামাজিক দূরত্ব ক্রমশ লোপ পায়, এবং এই কাঠামোয় আয় অথবা সম্পদ ও পেশাগত মর্যাদা সামাজিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। এই নতুন শহুরে সমাজ কাঠামোয় দ্রুত সম্প্রসারিত বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেনী পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ক্ষুদ্র উচচ শ্রেনীর সাথে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবি, অধ্যাপক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী ও ব্যবসায়ী ইত্যাদি বিভিন্ন পেশাজীবি লোক সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রভাবশালী

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেনীর অভ্যুদয় তখনকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে এক সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক নীতির কারণে উদীয়মান বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেনীর ভেতর মারাত্মক অসন্তোষের জন্ম হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কেন্দ্রীয় সরকার কখনো শক্ত বুনিয়াদ দেবার চেষ্টা করেনি। কারণ পশ্চিমের শিল্পায়ন যাতে ব্যাহত না হয় এবং তার বাজার হিসেবে বাংলাদেশে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী গড়ে না ওঠে। বছর বছর যে বিভেদ জমেছে তার চার্ট তৈরী না করে বরং মোট খরচের অনুপাতে বিশ্লেষন করলেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

তেইশ বছরে পাকিস্তানের মোট রাজস্ব-খাতে ব্যয় হয়েছে সাড়ে ছ'হাজার কোটি। তার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের খাতে পাঁচ হাজার কোটি, আর পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে দেড় হাজার কোটি। ঠিক ঐ একই সময়ে উন্নয়ন খাতে পশ্চিম পাকিস্তান পেয়েছে মোট খরচের দুই-তৃতীয়াংশ। পশ্চিম পাকিস্তানে জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার জন্যে বাঁধ হয়েছে তিনটি, সেখানে বাংলাদেশে একটি। মাথাপিছু আয়: বাংলাদেশে ১৯৪৯ থেকে ১৯৬৫-র মধ্যে মাথাপিছু আয় ৩০৫ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৩২৭ টাকা অর্থাৎ বাইশ টাকা বেড়েছে ষোল বছরে। ঠিক ঐ একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে মাথাপিছু আয় ৩৩০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৬৪ টাকার মত। অর্থাৎ ষোল বছরে বেড়েছে ১৩৪ টাকা।

পূর্ব পাকিস্তানের জীবন যাত্রার মান বাড়া দূরে থাক এটা সব সময়ই পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে কম ছিল। ১৯৫৯-৬০ থেকে ১৯৬৩-৬৪ এই পাঁচ বছরে পূর্ব পাকিস্তানে মাথাপিছু উন্নতির হার ২.৬% ভাগ। ঐ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে উন্নতির হার শতকরা ৪.৪ ভাগ। পাকিস্তানের বৈদেশিক রপ্তানীর মূল ভিত্তি বাংলাদেশের পাট, চা এবং চামড়া। রপ্তানী আয়ের শতকরা ষাট ভাগ আসে বাংলাদেশের পন্যে এদিকে বাংলাদেশ আমদানীর অংশ পেয়েছে শতকরা ত্রিশ ভাগ।

এছাড়া আরো লক্ষ্যণীয়, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে মূল্যের জিনিষ নেয়া হয়,পূর্ব থেকে সে মূল্যের জিনিষ নেওয়া হয় না । ১৯৬২-৬৩ সালের হিসেব নিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। ঐ বছর পশ্চিম থেকে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে পণ্য পাঠানো হল নয়শো সতের কোটি টাকার। আর বাংলাদেশের কাছ থেকে কিনলো মাত্র চারশো ছেচল্লিশ টাকার জিনিস।

পাকিস্তানের মাত্র চব্বিশটি সংস্থা সর্বমোট ব্যক্তিগত শিল্প সম্পদের প্রায় অর্ধেকের নিয়ন্ত্রক। ব্যাংক ও বীমা কারবারের মোট শেয়ারের তিন-চতুর্থাংশের মালিক মাত্র পনেরটি পরিবার। ফলে নতুন শিল্পে টাকা লগ্নীর ক্ষেত্রে এরা অন্যদের চেয়ে সরাসরি এগিয়ে ছিল। এই অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রনের পাশে ছিল বড়ো বড়ো চাকুরী, সরকারী দপ্তরে, সেনাবিভাগে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এদের নিজেদের দলীয় লোক। এমনকি রাজনৈতিক নেতাদেরও এরা পোষণ করত। পশ্চিম পাকিস্তানের এই বিত্তশালী গোষ্ঠীর হাতেই ছিল দেশের শতকরা পঁচাশি ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী এবং শতকরা নব্বই ভাগ সমর বিভাগের চাকুরী। তাই এদের লোক বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত মূল সংস্থাগুলির প্রধান হিসেবে কাজ চালিয়ে এই গোষ্ঠীদের স্বার্থ স্থায়ী ও দৃঢ় করার চেষ্টা করেছিল।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মধ্যবিত্ত শ্রেনীর অসন্তোষজনক মনোভাব ব্যক্ত করে পাকিস্তান গণ পরিষদে বেগম শায়েস্তা সোহরাওয়ার্দী ইকরামুল্লাহ বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে এরকম একটি অনুভূতির বিকাশ ঘটছে যে, পূর্ব পাকিস্তান উপেক্ষিত এবং পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ (কলোনী) হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে'।[১] পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গের বৈষম্যমূলক নীতি দুই অঞ্চলের ভেতর মারাত্মক অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্যের জন্ম দেয়। আর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের এ বৈষম্যমূলক নীতি পূর্ব বাংলার সমাজ কাঠামোয় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

এ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য এখানে পরিবেশন করা প্রয়োজন। ১৯৫২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে কর্মরত ১৩ জন সচিবের সকলেই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী, আর ১৬ জন যুগ্ম সচিব ও ৫৯ জন উপসচিবের ভেতর বাঙালীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ ও ৪। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে নিয়োজিত পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল ৪২ হাজার, আর পূর্ব পাকিস্তানে ছিল মাত্র ২ হাজার

---

১. রংগ লাল সেন- *"বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস"*, পৃঃ ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

৯ শো। বেতন হিসাবে পশ্চিমারা পেত ১১ কোটি ৪০ লাখ টাকা এবং পূর্ব পাকিস্তানে আসত শুধু ৬০ লাখ টাকা। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের হার আরো অধিকতর বৈষম্যমূলক ছিল। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত প্রতিরক্ষা খাতে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয় ৪৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আর পূর্ব বাংলায় মাত্র ১০ কোটি টাকা। প্রতিরক্ষা খাত ছাড়া ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থব্যয়ের পরিমান ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে ৭৯০ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা, কিন্তু পূর্ব বাংলায় ছিল শুধু ৪২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। উল্লেখিত বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি সচেতন ছাত্র ও শিক্ষিত পেশাজীবি গোষ্ঠীর পাকিস্তানী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রথম প্রয়াস হচেছ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পূর্বে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার তথা পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ বিরোধী ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট গঠন।

মোট কথা, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম কৃষক সমাজ থেকে উদ্ভূত একটি বিকাশমান অথচ অসন্তুষ্ট শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ষাটের দশকের আগে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে সোচচার হয়ে ওঠে। এ পটভূমিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও যুব আন্দোলনের বিকাশ ঘটে। তারা পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেছিল মূলত: অর্থনৈতিক কারণে। অধিপতি শ্রেনীর শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্খা থেকে তারা পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রটি শেষ পর্যন্ত যে আদলে তৈরী হল এবং এর রাষ্ট্রীয় চরিত্রের যে প্রাথমিক আভাস পাওয়া যাচিছল তাতে তাদের সে আকঙ্খা পূরণ হবার কোনো লক্ষণ চোখে পড়ছিল না। বরং আশাভঙ্গের যথেষ্ট আলামত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। দ্রুত অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবিত্তের মূল প্রতিনিধিদের পাশ কাটিয়ে যেভাবে নিপীড়ণবাদী রাষ্ট্র ও রাজনীতি পরিচালনা করা হচিছল তাতে করে স্বাভাবিক কারণেই এ অঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেনী হতাশ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। কৃষক, শ্রমিক, নিম্নবেতনের কর্মচারীদের বেঁচে থাকার জন্য ন্যুনতম দাবীদাওয়া মেটানোর ক্ষেত্রেও নতুন রাষ্ট্রের অনীহা ও অসদাচারণ সাধারণ মানুষকে ও হতবাক করে ফেলে। সে রকম একটি অস্থির সমাজে যখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ভাষার ওপর রাষ্ট্রীয় আঘাত এলো তখন তাদের জাতীয় সত্তা খুবই দ্রুত বিকশিত হতে থাকে। তারা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন শ্রেনী তখন প্রতিবাদের এক অভিন্ন লক্ষ্য খুঁজে পায়। সেই অর্থে ভাষা আন্দোলন বাঙালীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম সফল বহি:প্রকাশ।

বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি প্রচ্ছন্ন ভাবে কয়েক দশক থেকে বিভিন্ন ভাবে উথাপিত হয়ে আসছিল। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রশ্নটি সরাসরি সাধারণ মানুষের সামনে চলে আসে। এ আন্দোলন পাকিস্তানের নৈতিক ভিত্তি নড়বড়ে করে ফেলে আর বাঙালী জাতীয়তাবাদ এক নতুন সম্ভাবনার সন্ধান পায়। সেই স্বতন্ত্র জাতীয় চেতনা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রতিফলিত হতে থাকে এবং দৃঢ় ভিত্তি পেতে থাকে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগের পরাজয় এবং যুক্তফ্রন্টের প্রতি মানুষের স্বত:স্ফূর্ত সমর্থন, ষাটের দশকে স্বৈরাচার ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম এবং পরিশেষে একাত্তরের রক্ত ঝরানো সফল মুক্তিযুদ্ধ সব কিছুরই ভিত্তি তৈরী করেছিল ভাষা-আন্দোলন।

উল্লেখ্য ভাষা-প্রশ্নে অপেক্ষাকৃত সচেতন বাঙালীরা আটচল্লিশেই 'মাথা নত না করার' সিদ্ধান্ত নিলেও ৪৮-৫২ পর্বে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-কর্মচারী তথা সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামতে থাকে। আন্দোলন যতই বেগ পেতে থাকে এর জাতীয় চরিত্র ততই স্পষ্টতর হতে থাকে। বিভিন্ন সামাজিক বর্গের অংশগ্রহণই শুধু যে সেই জাতীয় চরিত্রের ধাঁচ তৈরী করছিল তা কিন্তু ঠিক নয়। ভৌগলিক চৌহদ্দিতেও আন্দোলন জাতীয় রূপ পাচ্ছিল। ঢাকা থেকে আন্দোলনের উৎপত্তি হলেও বিভিন্ন মফস্বল শহর, এমনকি গ্রামে-গঞ্জে তা ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র-বুদ্ধিজীবি, শিক্ষক ও অন্যান্য মধ্যবিত্তের পাশাপাশি শ্রমিক, কৃষক এবং ছোটখাট ব্যবসায়ীদেরও আন্দোলনে অংশ নিতে দেখা যায়। তবে আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল মধ্যবিত্তের হাতে। সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের পরিমন্ডলের মধ্যে থেকেও ধর্মনিরপেক্ষ গনতান্ত্রিক ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী একটি ধারাকে বিকশিত করার জন্য পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্তকে পার হয়ে আসতে হয়েছে ইতিহাসের এক জটিল পথ। আটচল্লিশ থেকে বায়ান্ন পর্যন্ত সময়টি আসলে উত্তরণের কাল।

১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, উনপঞ্চাশ সনে আওয়ামী লীগের জন্ম, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্ন সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্টের অভূতপূর্ব সাফল্য,

Dhaka University Institutional Repository

সাতান্ন সালে আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে র‍্যাডিকেল পার্টি হিসেবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অভ্যুদয়, শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদে বাষট্টির ছাত্র গণ-আন্দোলন ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৮-৬৯ সালে ছাত্রদের ১১ দফার সংগ্রাম, ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় ও ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীর ক্রম বিবর্তনের ফল।

ঐ সব আন্দোলন ও সংগ্রামে বাংলাদেশের যারা বিরোধিতা করেছিল কিংবা দোদুল্যমান ছিল তারা সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। তারা মূলত ছিল গ্রামের ধনী ভূ-স্বামী,জোতদার ও শহুরে মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া। ষাট দশকের মাঝামাঝি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইউব খাঁ-প্রবর্তিত অভিনব বুনিয়াদী গণতন্ত্র ও উহার আনুষাঙ্গিক ওয়ার্কস প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে যথাক্রমে জোতদার ও ধনী কৃষক এবং ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার শ্রেনী তাদের পূর্বতন ক্ষমতার ভিত্তি আরো সুদৃঢ় করে। বস্তুত এরাই তখনকার পাকিস্তানী শাসকশ্রেনীর শক্তিশালী সমর্থক হিসাবে কাজ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত বুনিয়াদি গণতন্ত্র ও উহার আনুষঙ্গিক উপাদান হিসাবে ওয়ার্কাস প্রোগ্রামের প্রবর্তন গ্রাম ও শহরাঞ্চলে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়।

পাকিস্তান আমলে শহুরে সম্পদ ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীকে আরো শক্তিশালী করার নীতি ছাড়াও প্রেসিডেন্ট আইউব খাঁর শাসনের সময় পূর্ব বাংলায় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী কৃষক শ্রেনী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কতক ভূমি সংস্কারের পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ঐ লক্ষ্যেই পরিবার প্রতি জমির সর্বোচচ পূর্বতন সীমা ১০০ বিঘার পরিবর্তে ৩৭৫ বিঘায় উন্নীত করা হয়।[২] এতে শহুরে আমলা মুৎসুদ্দী শ্রেনী সমর্থন যোগায়। কারণ এদেরও গ্রামে প্রচুর জমি রয়েছে।

অন্যদিকে কৃষক সংগঠন দূর্বল থাকায় এবং তাদের সংগ্রাম জোরদার করতে না পারায় এ প্রক্রিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে গ্রামাঞ্চলের জোতদার ও ধনী কৃষক আরো সম্পদশালী হয় এবং দরিদ্র

---

২. রংগ লাল সেন- "*বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস*", পৃঃ ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

কৃষক দরিদ্রতর হয়। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ষাট দশকের গোড়ার দিকে শতকরা প্রায় ২০ ভাগে দাঁড়ায়। মোটামুটি ভাবে বলা যায়, পাকিস্তানের প্রথম দশক পার্লামেন্টারি শাসনের যুগ। আর দ্বিতীয় দশক তথা ষাটের দশক সরাসরি সামরিক শাসনের দুঃসময়। সামরিক শাসনামলে পাকিস্তানের সর্বক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি আরো জোরদার করা হয়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পূর্ব বাংলাকে পর্যুদস্ত করে রাখার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমাজে সামরিক শাসক শ্রেনীর সমর্থক গোষ্ঠী সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে গ্রামীণ ও শহুরে অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো হয়। এতে গ্রাম বাংলার সমাজে দারিদ্র ও বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

ষাটের দশকের মধ্যভাগে পূর্ব বাংলার কৃষি সমাজে একদিকে সাম্রাজ্যবাদী দাতা দেশগুলোর পরামর্শে ধনবাদী কৃষি উন্নয়নের ফলে গ্রামে এক শ্রেণীর ধনী কৃষকের জন্ম হয়, অন্যদিকে ভূমিহীন ও ক্ষেত মজুর শ্রেনীরও একটি সুস্পষ্ট আকৃতি গড়ে উঠে। ১৯৫১ সালে ভূমিহীনের সংখ্যা ছিল শতকরা ১৪.৩ ভাগ যা ১৯৬১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭.৫ ভাগে দাঁড়ায়। এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে এর পরিমান শতকরা ২০ ভাগে উন্নীত হয়। উক্ত ধনবাদী ধারায় সৃষ্ট গ্রামের বিত্তবান শ্রেণীর হাতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়।

১৯৬০-৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীন জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৫২ ভাগ পরিবার ও জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ ছিল সম্পূর্ন দরিদ্র। আর ঐ সময় গ্রামীন জনসংখ্যার মধ্যে পরিবার হিসাবে শতকরা ১০ ভাগ ও জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ ছিল চূড়ান্ত দরিদ্র। কিন্তু ১৯৬৮-৬৯ সালে এটি বেড়ে সম্পূর্ন দরিদ্র পরিবারের শতকরা হার দাঁড়ায় ৮৪ ভাগে, গরিব জনসংখ্যা হয় শতকরা ৭৬ ভাগ। তেমনি চূড়ান্ত দরিদ্র পরিবারের শতকরা হার প্রায় ৩৫ ভাগে পৌঁছায়, যা মোট জনসংখ্যায় ২৫ ভাগ। গ্রামীন নি:স্ব করণের এ প্রক্রিয়া আজও অব্যহত আছে। ১৯৬৩-৬৫ সালে গ্রামের ২৫ ভাগ মানুষ কৃষি মজুরির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে কৃষি মজুরিও ক্রমাগত কমতে থাকে। ১৯৫০ সালে যেখানে ছিল মাথাপিছু প্রতিদিন কৃষি মজুরি প্রায় ৩ টাকা

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে তার এক দশক পরে ১৯৬০ সালে তা কমে গিয়ে মাত্র ২ টাকায় নেমে আসে।

আইয়ুব সরকার কর্তৃক তথাকথিত "বুনিয়াদী গণতন্ত্র" প্রবর্তিত হওয়ার ফলে পাকিস্তানের সমাজ কাঠামোর বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে সমান সংখ্যক ৪০ হাজার "মৌলিক গণতন্ত্রী" তথা সর্বমোট ৮০ হাজার রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির জন্ম দেওয়া হয়। ১৯৬২ সালের ১ মার্চ আইয়ুব খান একটি অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র ঘোষনা করেন, যা বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তি ও ছাত্র সমাজ বর্জন করে।

১৯৬৪ সালে বাংলাদেশে মৌলিক গণতন্ত্রীদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৮১ ভাগ ছিল ধনী কৃষক ও জোতদার, আর শহরে প্রায় ৭৫ ভাগ ছিল ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার। পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা এমনই একটি রূপ ধারণ করে যেখানে একদিকে শহর ও গ্রামাঞ্চলে যথাক্রমে একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ বুর্জোয়া এবং জোতদার ও ধনী কৃষক মহাজন শ্রেনী, অপরদিকে বিভিন্ন পেশাদারি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেনী, গরীব কৃষক ও শিল্প শ্রমিক সমন্বয়ে গঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠ অসন্তুষ্ট জনগোষ্ঠী লক্ষ্য করা যায়। শেষোক্ত শ্রেনীগুলো পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

ষাট দশকের মধ্যভাগে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোয় যে একটি বিকাশমান বাঙালি মুসলিম বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় তার উদ্ভবের পটভূমি খুঁজতে গেলে বিশ শতকের গোড়ার দিকে যেতে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিশ্বের বাজারে পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় পাট উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র পূর্ববাংলার বৃহত্তর মুসলিম ধনীকৃষক জনগোষ্ঠী এত লাভবান হয়। শুধু পাট উৎপাদন করেই তারা উপকৃত হয়নি, পাটের ব্যবসা করেও বাঙালী মুসলিম জনগোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ বিরাট অর্থের মালিক হয়। ঐ সময় বুর্জোয়া শ্রেনীর ভ্রুণ গড়ে উঠে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে অবিভক্ত বাংলায় ফজলুল হক, নাজিমউদ্দিন ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীনে কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সালে ভারত

Dhaka University Institutional Repository

বিভক্তি পর্যন্ত যখন ক্ষমতাসীন ছিল তখন ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকারের নীতি ও ১৯৪৩ সালের মারাত্মক দূর্ভিক্ষের ফলে বাংলার মফস্বল এলাকায় এক শ্রেনী বিত্তশালী হয়ে উঠলে বাংলার সমাজে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানি আক্রমনের ভয়ে বৃটিশ সরকার খাদ্য চলাচলের ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহন করে তার ফলে বাংলায় মারাত্মক দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যা ইতিহাসে পঞ্চাশের (১৩৫০ বাংলা) মহা মন্বন্তর নামে পরিচিত। উল্লেখ্য শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের বিখ্যাত দূর্ভিক্ষের চিত্র কর্ম "ম্যাডোনা-৪৩" ঐ পটভূমিতেই সম্পন্ন হয়।[৩] বাংলাদেশ তথা এ উপমহাদেশে যে কালো টাকার দাপট তার সূত্রপাত সম্ভবত ১৯৪৩ সনের (১৩৫০ বাংলা) মহা মন্বন্তরের সময় ঘটে। ঐ সময় রেশন ব্যবস্থার জন্য সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মজুদদারি ও চোরাচালান স্বাভাবিক ব্যবসায়ের অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় যা আজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিব্যাপ্ত।

পূর্ববঙ্গে যে কয়টা কাপড়ের মিল ছিল তা থেকে পূর্ববঙ্গের কাপড়ের চাহিদা প্রায় মিটে যেত। পশ্চিম পাকিস্তানে কাপড়ের মিল ছিল না বললেই চলে। কিন্তু ষাট দশক শেষ হওয়ার আগেই পূর্ববঙ্গের প্রতিষ্ঠিত কাপড়ের মিলগুলোকে শত্রু সম্পত্তি ঘোষনা করে সরকার নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু করে। পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানে নতুন গড়ে উঠা বস্ত্র শিল্পের বাজারে পরিণত করার জন্য সরকার সুচিন্তিত ভাবে এটা করেছিল।

পূর্ববঙ্গকে এভাবে শোষণ করা সম্ভব হয়েছিল কারণ পূর্ববঙ্গের গণতন্ত্রের কণ্ঠকে আগেই রোধ করা হয়েছিল। শাসকচক্রের মধ্যে পূর্ববঙ্গের কোন বলিষ্ঠ প্রতিনিধি ছিল না। জনসাধারণের গণতান্ত্রিক দাবী যখনই দানা বেঁধেছে, প্রকাশ-উন্মুখ হয়েছে, তখনই পশ্চিমা শাসকচক্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে তা বিপথগামী করেছে। জনগণের বিক্ষোভ আশংকা করেই ১৯৬৪ সালে হযরত (দঃ) যাল ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করা হয়েছিল। বলা যায় ১৯৬৫ সালে একই কারণে পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

---

৩. এ বড়াল-*সাধারণ জ্ঞান*, পৃষ্ঠা নং ২৬

Dhaka University Institutional Repository

ষাট দশকের প্রথম থেকে বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাংবাদিকগণ পূর্ববঙ্গের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক নিপীড়ণের রূপটা অত্যন্ত জোরালো ও সহজবোধ্য ভাষায় জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুন ছাত্রদের কাছেও পাকিস্তান আন্দোলনের অর্থনৈতিক দিকটা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। তাঁদের কাছে অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল। তাই পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ও খবরদারী তাঁদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাঁদের চিন্তার সংস্পর্শে এসে সকল শ্রেনীর মানুষ প্রভাবিত হয়। এভাবে পূর্ববঙ্গে এক ধর্মনিরপেক্ষ গণ-আন্দোলন গড়ে উঠে।

পাকিস্তান ধ্বংস হওয়ার বীজ পাকিস্তানের জন্মের ইতিহাসে সুপ্ত ছিল বলা যায়। বাংলাদেশ সংগ্রামের ইতিহাস তার সামাজিক পটভূমিতেই নিহিত ছিল। বাংলাদেশের লক্ষ মানুষের পুণ্য শোণিতে দীক্ষিত এই সংগ্রাম সার্থক হয়ে জন্ম হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের।

সত্তরের দশকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র

অনেক আন্দোলনের ফসলস্বরপ একটি দীর্ঘ ও সফল সংগ্রামের পর একটি নতুন ও স্বাধীন রাষ্টের জন্ম হলো। যার নাম বাংলাদেশ। স্বাধীনতাত্তোর এদেশের মানুষ নতুন এক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলার চেষ্টা শুরু করে। আর তাদের এই চেষ্টাকে কেন্দ্র করে আমাদের আলোচনা আবর্তিত হবে।

পাকিস্তান আমলের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনগণ সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে যে গনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তা জাতীয় অর্থনীতির স্বাধীন বিকাশের লক্ষ্যে কতক প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বৃহৎ শিল্প, বীমা ও ব্যাংক ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়। কিন্তু উন্নয়নের অনুসৃত এ পথকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের পর্যাপ্ত সাংগঠনিক শক্তি ও দক্ষতা ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে, দেশের উন্নয়নের প্রয়াসকে সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল করে তোলা তথা সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যাভিমুখী উক্ত অর্থনৈতিক বিকাশের পথ পরিত্যাগ করার জন্য পাশ্চাত্যের সাহায্যদাতা পুঁজিবাদী দেশ থেকে প্রচুর চাপ আসে। সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী দেশীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিসমূহ একসাথে দেশের উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু শাসক দল দেশের ভেতর ও বাইরের ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য যথেষ্ট সচেতনতা প্রর্দশন করতে পারেনি। দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল ও স্বাধীনতার পক্ষের রাজনৈতিক দলসমূহ থেকে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সাবধান করে দিলেও এক্ষেত্রে শাসক দল আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসেনি। এখানে এ কথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আওয়ামী লীগ সরকারের অনুসৃত অনেক প্রগতিশীল পদক্ষেপ সরকার এর অভ্যন্তর থেকে বানচাল করে দেয়া হয়। যেমন, পরিবার প্রতি ১০০ বিঘা জমির সর্বোচচ সিলিং কার্যকরী করার পথে পরিবারের নতুন সংজ্ঞা নিরুপনের উদ্যোগ সরকারের উচচমহল থেকে নেয়া হয়। সরকারের আমলারাও এর স্বপক্ষে ছিল না।

সে যা হোক, অবশেষে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ সরকার প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় ঐক্য গঠন ও দেশের অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক ধারায় গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী তথা কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) প্রতিষ্ঠার কথা জাতীয় সংসদে এক ঐতিহাসিক ভাষনের মাধ্যমে ঘোষনা করেন। ১৯৭৪ সালের শেষের দিকে শেখ মুজিব জরুরী অবস্থা জারি করার ফলে মৌলিক অধিকার স্থগিত হয়ে যায়, নিষিদ্ধ হয়ে যায় সমস্ত রাজনৈতিক তৎপরতা। এই অবস্থায় বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক দলের সমর্থনে জনগণ এগিয়ে আসলে ১৯৭৫ সালে জানুয়ারী মাসে জারী হল এক দলীয় শাসক-ব্যবস্থা। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়ে গঠিত হলো একটি মাত্র দল বাকশাল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট এক অভ্যুৎথানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করলে এ পদক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়।

পনেরই আগষ্টের পর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সরকার বেসরকারী খাতকে রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়ার নীতি গ্রহণ করে। এরই সূত্র ধরে পূর্ববর্তী সরকারের জাতীয়করণকৃত শিল্পকে পর্যায়ক্রমে ব্যাক্তি

Dhaka University Institutional Repository

মালিকানায় ছেড়ে দেয়ার পক্ষে ব্যবস্থা নেয়া হয়। এরই এক পর্যায়ে বি. এন. পি প্রধান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সামরিক বাহিনীর একটি অংশের দ্বারা নিহত হন। এভাবে বার বার সরকার পরিবর্তন হতে থাকলে বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা যায়।

এক সমীক্ষায় জানা যায় যে, ৫০০০ পরিবার গ্রাম-বাংলাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে নিয়ন্ত্রন করে। কারণ আত্মীয়-স্বজন দ্বারা সরকারের সকল উচচপদ সমাসীন।[৪] কৃষিপ্রধান দেশে জমির মালিকানার ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস হতো। ১৯৭৭ সালের এক জরিপে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের মোট কৃষি পরিবারের ৯.৬৭ শতাংশ পরিবার মোট জমির ৫০.৬৮ শতাংশের মালিক। অন্যদিকে ৭৭.৬৭ শতাংশ পরিবারের অধীনে আছে মাত্র ২৫.১৭ শতাংশ জমি। ৩২.৭৯ কৃষকের কোনো জমি নেই। ১৯৮০ সালের আরেক জরিপে জানা যায় যে, দেশের ২৫.১ শতাংশ আবাদি জমি ২ শতাংশ লোকের মালিকানায় রয়েছে। অপরদিকে, দেশের ৫০ ভাগ চাষীর মালিকানায় আছে মাত্র ৪.৮ শতাংশ জমি। দেশের অল্প জমির মালিক দ্রুত জমি হারাচেছ। ১৯৭১-৭৬ সালের ভেতর গ্রামের জমি-জমার কেনা-বেচা ৫ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। এক হিসেবে জানানো যায় যে, ১৯৭১ সালে গ্রাম বাংলায় বিক্রিত জমির পরিমান ছিল ৬৪,০৬৪ একর। বিক্রীত জমির আয়তন খুবই ক্ষুদ্র। এর অর্থ হচেছ ছোট ও মাঝারি গরিব কৃষকেরাই মূলত তাদের জমি বিক্রি করছে।

মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি রপ্তানির সাথে বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে জমি হস্তান্তরের হার বৃদ্ধির একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত প্রচুর পয়সার মালিক শহরবাসী অকৃষকরাই শুধু জমি কিনেনি, গ্রামের ধনী কৃষক, মহাজন ও জোতদাররাও গরিব কৃষকদের জমি কিনে তাদের জমির পরিমান আরো বাড়িয়েছে। এছাড়া, অনেক ছোট কৃষক মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জনের আশায় চাকুরী নিয়ে যাবার সময় নিজের জমিজমা বিক্রি করে এবং অর্থ উপার্জন করে দেশে ফিরে আবার জমি

৪.বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস, পৃঃ ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

কিনেছে। অবশ্য অনেক সরল ও গরিব কৃষক আদম বেপারির খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে এরও বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের লগ্নি প্রথা কৃষকদের ভূমিহীন করেছে। কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি, ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের সমস্যা, কৃষি উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ বৃদ্ধি, ছেলেমেয়েদের বিয়েতে ব্যয়বাহুল্য, মামলা-মোকদ্দমার খরচ ও সর্বোপরি, জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে গরিব ও মাঝারী কৃষকের হাত থেকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জমিজমা হস্তান্তরিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, ঢাকার অদূরে শ্রীনগরের প্রতিটি গ্রামে বছরে গড়ে ৭ জন করে কৃষক ভূমিহীন হতো। সেখানকার কৃষি জমির অধিকাংশ মালিক ছিল হয় ঢাকার বড় চাকুরে কিংবা ব্যবসায়ী, অথবা মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ। আর এদের মধ্যে ছিল কিছু স্থানীয় জোতদার ও মহাজন। এভাবে অকৃষকরাই হচ্ছে কৃষি জমির অধিকাংশের মালিক। ভূমিহীনদের অনেকেই একসময় মধ্য কৃষক ও গরিব কৃষক থাকলেও তখন অনেকেই ছিল দিন মজুর ও ক্ষেত মজুর। গ্রামে জোতদার ও আধা-জোতদারের শোষণ আরও তীব্র হয়। বড় চাকুরে, ধনী ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহাজনরা টাকা পয়সা দিয়ে গরিব কৃষকদের কারণে-অকারণে সাহায্য করতে ব্যস্ত থাকে। ঋণগ্রস্ত কৃষক জমির মায়া ছেড়ে দিয়ে মহাজনদের কাছ থেকে মুক্তি পায়। এ পরিস্থিতি বাংলাদেশের সর্বত্র কম বেশী বিদ্যমান।

গ্রামে-গঞ্জে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় লগ্নি ব্যবসা জমজমাট ছিল। গ্রামের ধনী কৃষক ও জোতদাররা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের সুবিধা পেয়ে অল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করে বেশী সূদে কৃষকদের ঋণ দিত। অর্থাৎ নিজের মূলধন না খাটিয়েও ব্যাংকের টাকায় এক শ্রেনীর মহাজন লগ্নি ব্যবসা করে। সৃষ্টি হয় নতুন কাঁচা টাকার মালিক। গ্রামে কৃষি উন্নয়নের নামে এক শ্রেনীর মধ্যস্বত্বভোগীর জন্ম হয়। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরনের সাথে সাথে নতুন টাউট শ্রেনীর উদ্ভব ঘটে এবং পুরাতন টাউট শ্রেনী শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়। এতে গ্রামের নিরীহ কৃষকরা নতুন করে এদের শিকারে পরিণত হয়।

গ্রামে রাস্তাঘাটের উন্নতি ও বিদ্যুতায়ন কর্মসূচীর বিস্তৃতির কারণে জমিজমার মূল্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় নিম্নবিত্ত লোকেরা জমির অধিক মূল্যের লোভে নব্য ধনীদের কাছে নিজেদের জমি বিক্রি করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের খাস জমিও ধনীকৃষকরা বেনামীতে বন্দোবস্ত নিয়েছে। এসব কারণে গ্রাম থেকে শহরে লোকের ভীড় বাড়তে থাকে। কৃষি উন্নয়নের স্বার্থে গ্রামে যে নলকূপ এর ব্যবস্থা ছিল তারও ফায়দা জোতদার ও ধনী কৃষকরা নিয়েছে। এরা ছোট কৃষকের কাছ থেকে পানির জন্য বেআইনী কর আদায় করে। গরিব কৃষকের কৃষি উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে কৃষিকার্যে তারা লাভবান হচ্ছে না দেখে গ্রামের জমিজমা বিক্রি করে শহরে চলে আসে এবং শহরের গরিব মেহনতি জনতায় রূপান্তরিত হয়।

স্বাধীনতা- পরবর্তীকালে শাসকশ্রেনীর পক্ষ থেকে তথাকথিত ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতার কাঠামোয় স্থিতাবস্থা বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে। জমির মালিকানা ব্যবস্থায় কোনো মৌলিক পরিবর্তন না এনে জোড়াতালি দিয়ে সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধির সাথে সাথে নানা ধরণের অসন্তোষ ও অস্থিরতা বেড়েছে। গ্রামের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতার কাঠামো একান্তভাবে ভূমিমালিকানার ওপর নির্ভরশীল। ১৯৭৮ সালের এক সমীক্ষায় জানা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদে ৩.০ একর পর্যন্ত জমির মালিকের ভেতর কেহ চেয়ারম্যান হতে পারেনি। ২.০ ও ৩.০ একর পর্যন্ত জমির মালিকের মধ্যে যথাক্রমে ১৮.২ ও ২৫.০ শতাংশ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য। ৩ থেকে ৭ একর পর্যন্ত জমির মালিকের ভিতর ৩৮.৬ শতাংশ সদস্য ও ৩৫.০ শতাংশ চেয়ারম্যান আছেন। ৭ একরের উর্ধ্বে জমির মালিকের মধ্যে সদস্য ও চেয়ারম্যান রয়েছেন যথাক্রমে ১৮.২ ও ৬৫.০ ভাগ।

কৃষি উৎপাদনের মূল ক্ষেত্র জমিতে উপরোক্ত ধরণের অসম মালিকানা ভিত্তিক গ্রামীণ ক্ষমতার বিন্যাস বিদ্যমান থাকায় বাংলাদেশে গরীব ও ভূমিহীন কৃষকের স্বার্থে কোন ভূমিসংস্কার সম্ভব হয়নি। কারণ স্থানীয় স্বার্থবাদী মহল ও সরকারী আমলারা একযোগে মৌলিক ভূমি সংস্কারের বিরোধীতা করে। তবে বিভিন্ন বামপন্থী ও কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে কৃষক সমিতি ও ক্ষেত মজুরদের সংগঠন বিস্তার লাভ করছে। দেশের গরিব কৃষকরা ক্রমশ শ্রেনী সচেতন হয়ে উঠে এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামে কৃষক সংগঠন শক্তিশালী হওয়ার সাথে সাথে শহরের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের আন্দোলনও ক্রমশ জোরদার হয়েছে। বাংলাদেশের শ্রমিকরা মূলত গ্রামের দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক থেকে আগত। এরা গ্রামের সংগে সম্পর্কহীন নয়। চিন্তা-চেতনার দিক থেকেও তারা ছিল পশ্চাৎপদ। তবে দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের বামপন্থী প্রগতিশীল শ্রমিক সংগঠনগুলির আন্দোলন বিকাশ লাভ করায় শ্রমিকরা তাদের নিজস্ব দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে আন্দোলন সংগঠিত করেছে। শ্রমিকরা যতই সংগঠিত হচেছ ততই তাদের শক্তি সংহত হচেছ এবং সমাজের আমূল পরিবর্তনে তাদের বৈপ্লবিক ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হচেছ।

শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের সমস্যা ছিল যা আজও জাতীয় সমস্যা হিসেবে স্বীকৃত। শহর ও গ্রামে বেকারের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলছিল। বিরাট সংখ্যক যুবকের কারণে সমাজে নানাবিধ অনাচার, অশান্তি ও অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছিল। উন্নয়ন কার্যক্রম বিঘ্নিত হচিছল। শিক্ষিত যুবকদের পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান না হওয়ায় দেশের দক্ষ জনশক্তি কর্মহীন হয়ে পড়ছিল। চিকিৎসক, প্রকৌশলী কৃষিবিদ ও আইনবিদদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিজেদের নিয়োজিত করতে না পেরে যারা ভাগ্যবান তারা বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন।

কিন্তু এতে দেশের যুবকদের সামগ্রিক সমস্যার সমাধান না হওয়ায় উচচ শিক্ষার প্রতি সাধারণ ভাবে মানুষের মনে অনীহার ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে, যা জাতির জন্য মোটেই মঙ্গলজনক নয়। এ প্রসঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধির কারণে যে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা কমছে সে বিষয়ে কিছু তথ্য তুলে ধরা যায়। ১৯৭৩-৭৪ সালে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৬,৮৩৬ জন সেখানে ১৯৭৯-৮০ সালে ২৭,৪০০ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে রকম মাধ্যমিক স্তরেও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাচেছ। যেমন, ১৯৭৭-৭৮ সালে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২,৬৩৮৯৭ জন কিন্তু ১৯৭৯-৮০ সালে এদের সংখ্যা ২,২৩,৯৬৫ জন।[৫] এভাবে শিক্ষা ক্রমশ দেশের মুষ্টিমেয় বিত্তবান লোকের

৫.বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস পৃঃ১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হওয়ার কারণে সামাজিক ব্যবধান বেড়েছে। কেননা শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণী-নির্বিশেষে সকলের অধিকার স্বীকৃত হলে শিক্ষা সমাজে সচলতা সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সমাজে শ্রেনী বৈষম্য মারাত্মক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশে নিরন্নভূমিহীন কৃষক ও বিলাসবহুল জীবন যাপনে অভ্যস্ত কোটি টাকার মালিকের সংখ্যা সমানতালে বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তাতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সীমাহীন দারিদ্র ও গুটিকয়েক লোকের অবিশ্বাস্য প্রাচুর্য পাশাপাশি বিদ্যমান। দেশের নব্য ধনীরা আমাদের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কলকাতায় নব্য ধনীরা যেভাবে জীবন যাপন করত সত্তরের দশকে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের লুটেরা ধনিকগোষ্ঠী এরকম বিলাস- ব্যসনে ব্যস্ত ছিল।

বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রচন্ড প্রভাব বিস্তারকারী প্রবণতা ছিল তার মাত্রাতিরিক্ত শহুরে জনসংখ্যাবৃদ্ধি। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের শহুরে প্রবৃদ্ধির হার এশিয়ার মধ্যে সর্বোচচ। শহরে কর্মসংস্থানের আশায় গ্রামের মানুষ বাস্তভিটা ছেড়ে চলে আসছিল। প্রায় নিয়মিত বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে ভীড় জমানোর প্রবণতাকে উৎসাহিত করছে। এর ফলে বস্তিবাসীর সংখ্যা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হচেছ এই যে, দেশের এক তৃতীয়াংশ কল কারখানা শহরে অবস্থিত। গ্রামাঞ্চল থেকে লোকের শহরে চলে আসার মূল কারণ কলকারখানা অথবা অফিস আদালতের অবস্থিতি তবু প্রকৃত পক্ষে খুব সামান্য সংখ্যক লোক আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে কাজ পাচেছ। অর্থাৎ শহরে আগতদের অধিকাংশই হয় বেকার, আর না হয় আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে এদের কারো কারো কোনো কাজ করে কোনো রকম বেঁচে থাকার এক কঠিন নিরন্তর জীবন সংগ্রাম। বাংলাদেশের শহর জীবনের প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যা গরিব মানুষের সুষ্ঠু আবাসিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি শহরে চলে আসা লোকজনের মধ্যে যেখানে শতকরা ৯৫ জনের গ্রামে নিজের বাড়িঘর ছিল সেখানে শহরে তাদের ৬০ ভাগেরও নিজের বাড়ি নেই। কদাচিৎ এরা বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার সুযোগ- সুবিধা পায়।

বৈদেশিক ঋণও বাংলাদেশের সামাজিক ভারসাম্য বিঘ্নিত করছে। কারণ ঋণের বোঝা দেশের ধনী-গরিব সবাই সমান ভাবে বহন করলেও তার প্রাপ্তি ও ব্যবহারে সমানাধিকার স্বীকৃত নয়। দেশের প্রভাবশালী অংশ এর সিংহভাগ ভোগ করছে কিংবা আত্মসাৎ করছে, আর দূর্বলতম গোষ্ঠী সমান ভাবে ঋণের বোঝা বহন করেও এর সামান্য অংশ তাদের ভাগ্যে জুটছে। বিদেশী ঋণ দেশের ধনিক শ্রেনীকে আরো ধনী হওয়ার সুযোগ করে দেয় অন্যদিকে দরিদ্রকে করে দরিদ্রতর।

দেশের সম্পদের একটি বিরাট অংক ক্রমান্বয়ে দেশের ছত্রিশটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তথা পরিবারের হাতে কুক্ষিগত। অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচীর অংশ হিসাবে সরকারের বেসরকারিকরণ উদ্যোগে প্রায় সবটাই ভোগ করে ঐ ছত্রিশটি পরিবার।[৬] এরাই দেশের ব্যাংক, বীমা, ইনভেস্টিং ও আমদানী রপ্তানী খাতকে নিয়ন্ত্রন করে। এদের অধিকাংশই আবার খেলাপী ঋণ গ্রহীতা। দেশের সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক এবং দু একটি বিদেশী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে এরা গড়ে তুলে নতুন নতুন ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী, নাম মাত্র মূল্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছে। তদুপরি নতুন নতুন ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রেও এরাই সর্বাধিক সুযোগ পায়। অর্থাৎ পাকিস্তান আমলের ষাট দশকের বাইশ পরিবারের স্থলে বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছে ছত্রিশ পরিবার।

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের জমি সবচেয়ে উৎপাদনশীল সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও তার মালিকানা কাঠামো মোটেও উচচ উৎপাদনশীলতার অনুকূলে ছিল না। আসলে কৃষিতে যারা শ্রম ও দক্ষতা বিনিয়োগ করতো সেই কৃষক শ্রেনীর বিরাট অংশের হাতেই প্রয়োজনীয় জমি ছিল না। ফলে কৃষি খাতে আশানুরূপ হারে উৎপাদন বাড়েনি। বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে যেটুকু

---

৬. রক্তাক্ত বাংলাগ্রন্থে মতিলাল পাল রচিত বাংলাদেশ ঃ অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত প্রবন্ধ থেকে পৃষ্ঠা- ১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নতি ঘটেছে তার সুফল ভোগ করত মুষ্টিমেয় মালিক কৃষক। এছাড়া, মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া এবং টাউট-বাটপারয়াও এর কিছু অংশ পেত।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশে শহুরে দারিদ্র ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচচ হার এবং উপর্যুপরি প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে দূর্বল করে দিয়েছে। ফলে গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর গমণ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল এবং এ কারণে একদিকে শহরের সম্প্রসারণ ঘটেছে, আর অন্যদিকে শহুরে দারিদ্র বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রাম থেকে আগত শহুরে গরিব লোকেরা বাংলাদেশের নগর বন্দরে এমনই ভীড় জমিয়েছে যে, তারা প্রায়ই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনো অনুমতির তোয়াক্কা না করে যেখানে সেখানে বসতি গড়ে তুলেছে। এরা জীবন যাত্রার মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী। তারা অতি সহজেই আর্থ সামাজিক ও পরিবেশমূলক সংকটের শিকার হয়, যার সাথে এক বিশেষ ধরণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া জড়িত। অতএব বলা যায়, শহুরে দারিদ্রের রয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশমূলক ও স্থানিক মাত্রা। বাংলাদেশের শহুরে জীবনে পাশাপাশি বৈপরীত্য বিদ্যমান। একদিকে রয়েছে দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য আর অন্যদিকে আছে তীব্র অভাব-অনটন ও প্রাচুর্য।

জনতাত্বিক ভাবেই রাজধানী ঢাকা শহর অন্যান্য শহরের চেয়ে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। যেমন- ঢাকা শহর যুবক যুবতীর ফল-কাকলীতে অধিকতর মুখরিত। ঢাকা শহরের অধিকাংশ মানুষই বৃহত্তর ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল ও নোয়াখালি জেলা থেকে এসেছে। ঢাকা শহরের ভূমি মালিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই সরাসরি জমি কিনে করায়ত্ব করেছে। এর দ্বারা সম্পত্তিবান শ্রেনীর সুস্পষ্ট সামাজিক গতিশীলতার প্রমাণ মেলে। শিক্ষার সাথে রয়েছে সম্পত্তি মালিকানার ইতিবাচক সম্পর্ক। যে যত বেশি উচচ শিক্ষার অধিকারী ছিল তারই সম্পত্তি লাভের সম্ভাবনা বেশী ছিল।

বিনোদনের জন্য ঘরের বাইরে যাওয়া শহুরে জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও ঢাকা শহরের বেশির ভাগ মানুষ সন্ধ্যার পরে ঘরে বসে সময় কাটাতো। অফিস অথবা ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ শেষে শতকরা ৬৪ ভাগ মানুষ ঘরে বসে বিনোদন করে এবং মাত্র ৬ ভাগ লোক বন্ধু বান্ধবের বাড়িতে বেড়াতে যেত। যারা ক্লাব ও অন্যান্য ধরণের বিনোদনের সুসংগঠিত

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রে যাতায়াত করত তাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। গৃহ প্রধান ব্যাক্তিদের শতকরা ২১ ভাগ কমবেশি রাজনৈতিক ও অন্যান্য ধরণের সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিল।[৭]

পরিবহন ব্যবস্থা ছিল ঢাকা শহরের আরেকটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যানবাহনের ধরণ ও তার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শহরবাসীর সামাজিক স্তরবিন্যাস স্পষ্ট হয়ে উঠে। এক জরিপে জানা গিয়েছিল ঢাকা শহরের পরিবার প্রধানদের শতকরা ৭.৬ ভাগ লোক গাড়ি ব্যবহার করত, যাদের মধ্যে শতকরা ৭৮.১ ভাগ ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিল। শতকরা ৫.৪ এবং ৪.৪ ভাগের রয়েছে যথাক্রমে মোটরযান ও বাই সাইকেল। যেহেতু শহরের অধিকাংশ মানুষ গরিব সেহেতু বাই সাইকেলই প্রধান যানবাহন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অবস্থাটা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। লোকজন বরং রিকশার প্রতি বেশি অনুরক্ত, যদিও এটি অধিকতর ব্যয়বহুল, মন্থর গতি সম্পন্নও ঝুঁকিপূর্ণ। জীবিকার উপায় হিসাবে রিকশার উপর নির্ভরশীল লোকসংখ্যার মধ্যে রিকশা চালক ছাড়া রিকশা প্রস্তুতকারী ও মেরামতকারী অন্তর্ভূক্ত ছিল। রিকশার উপর নির্ভরশীলতা ঢাকা ছাড়াও সকল ছোট বড় শহর বন্দরে বিদ্যমান। রিকশার উপর অতিশয় নির্ভরতার কারণ, দেশের গরিব জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থানের অনুপস্থিতি।

ঢাকার বিত্তবান ব্যক্তি অধিকাংশই ধনী হয়েছেন সত্তরের দশকে। তাদের সাফল্যের পিছনে রয়েছে বড় বড় রাষ্ট্রীয় ক্রয় ও প্রকল্পের সাথে দালালীর যোগ সূত্রতা। উড়োজাহাজ, পরিবহন এবং যোগাযোগের সরঞ্জাম, জাহাজ, সেতু, রাস্তা, কৃষি-যন্ত্রপাতি, তৈল উত্তোলনের কাজ এবং ব্যবসায়মূলক চুক্তি এসবের অন্তর্ভূক্ত। শিল্প অথবা অন্য ধরণের উৎপাদনমূলক কর্ম তৎপরতার মাধ্যমে ধনী হওয়ার দৃষ্টান্ত কম। এদের প্রাথমিক পর্যায়ে ধনসম্পদ সংগ্রহের সূত্র হচ্ছে "চৌর্যবৃত্তি"[৮] গচ্ছিত ধন অপহরণ এবং বলপূর্বক অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। আর এসবের সাথে জড়িত রয়েছে সরকারি

---

৭. সৌজন্যঃ *সাপ্তাহিক প্যানোরমা*।

৮. অপরের অজান্তে তার সম্পত্তি গ্রাস।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ ভান্ডার ও গুদাম, পরিত্যক্ত সম্পত্তি, চোরাচালান, মাদক দ্রব্যের ব্যবসা, ব্যাংক ঋণ পরিশোধ না করা, বিভিন্ন ব্যবসায়মূলক এজেন্সীর কমিশন প্রাপ্তি এবং ঘুষ-দুর্নীতি ইত্যাদি।

ঢাকা শহরে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রে বিদ্যমান দরিদ্র জনগণ কদাচিৎ তাদের মূল গ্রামের সাথে যোগাযোগ রাখতে পেরেছে। ধনী শ্রেনীর লোকেরাও তাদের গ্রামীণ বসতভিটার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে চায় নি। শুধু মাত্র নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেনীর লোকজন বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে কিংবা বৈষয়িক কারণে তাদের স্ব স্ব গ্রামের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখত। গরিবদের অতি সামান্যই ছিল তাদের গ্রামে, যার টানে তারা সেখানে যাবার উৎসাহ পেত। এসব গরিব লোকদের মধ্যে টাকা পয়সা অর্জনের পরিমান ও উপায় ভেদে বিভাজন সৃষ্টি হতো। শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেনীভূক্ত বেকার যুবকরাই বেশি ছিনতাই ও রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধ কর্মে লিপ্ত হয়ে সমাজকে কলুষিত করে ফেলে।

সত্তরের দশকে বাংলাদেশে যে অর্থনৈতিক ও সমাজচিত্র বিদ্যমান ছিল তাতে একটি বিশেষ শ্রেনীই উপকৃত হয়। বর্তমানেও বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়নি। অতএব বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনে যারা আগ্রহী তাদেরকে অবশ্যই উক্ত বাস্তব চিত্র বিবেচনায় রেখে এমন মৌলিক পরিবর্তনের কথা ভাবতে হবে যার ফলে ঐ ধরণের বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার চিরতরে অবসান ঘটে এবং এর পরিবর্তে একটি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এভাবেই রাজনীতির সাথে উন্নয়ন পদ্ধতির প্রত্যক্ষ সমন্বয় সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমস্যা

বাংলা ও বাঙালি জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ১৯৭১ সাল। সেই বৎসর বাঙালি জাতি তাদের শ্রেষ্ঠ স্বপ্নটি দেখেছিল এবং একটি মহৎ জীবন সংগ্রামকে অতিক্রম করে মহত্তম হতে পেরেছিল। ১৯৭১ সালের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ মূলতঃ ছিল নিপীড়ণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং এদেশের সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। এটা ছিল আপামর

Dhaka University Institutional Repository

জনসাধারণের মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তান থেকে বাঙালি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন শৃঙ্খল মুক্ত করার সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ হয়। বাঙালি জাতি হিসাবে আমাদের জীবন সত্ত্বাকে বাঁচাবার জন্যে, আমাদের ভাষা-কৃষ্টি, ইতিহাস, সাহিত্য সংস্কৃতি, দর্শণ- ঐতিহ্য, মানবিক মূল্যবোধ, ধর্ম ও সভ্যতা সর্বোপরি একটি সভ্য, আধুনিক, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গঠন করার লক্ষ্যে দীর্ঘ নয়মাস যুদ্ধ করে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটা একটি রূঢ় সত্য যে ভয়াবহ রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এবং জনগণের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে যে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে সেই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ছিল নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিরন্ন ও বস্ত্রহীন। মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। মানুষ মানবেতর জীবন-যাপন করে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী রাজত্ব বিরাজ করে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে সমাজ ধ্বংসের মুখে পতিত, অর্থনীতি দারুণভাবে বিপর্যস্ত সরকারের অযোগ্যতা, দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও জনবিমুখতা আমাদেরকে একটি আত্মমর্যাদাহীন জাতিতে পরিণত করেছে। দেশে কোন ন্যায় বিচার ছিল না, জনগণের জানমালের নিরাপত্তার অভাব অনুভূত হয়েছে। ধর্মের নামে অধর্ম বিস্তার লাভ করছে।

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা বিরোধীতা করেছিল, এদেশে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর দোসর হয়ে গণহত্যা, বুদ্ধিজীবি হত্যা, নারী ধর্ষণের মত জঘন্য অপরাধে সাহায্য করেছিল তাদের স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। তারা 'বাংলাদেশী' দেশপ্রেমিক নাগরিক হয়েছেন।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে জনগণকে গণতন্ত্রের জন্য তাদের ভোটের অধিকারের জন্য, আইনের শাসনের জন্য, হত্যার বিচারের জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে। দেশ নামে 'পূর্ব পাকিস্তান' থেকে বাংলাদেশ হয়েছে মাত্র। এটা সত্যিকার অর্থে কোন পরিবর্তন নয়। তাই জনগণের মধ্যে হতাশা বিরাজমান। অথচ আমাদের নেতা-নেত্রীগণ নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে বেশী তৎপর। জনগণের দুঃখ-দূর্দশার প্রতি তাদের নির্লিপ্ততা এবং প্রয়োজনের চেয়ে বেশী তাদের পদমর্যাদাবোধ, অর্থলিপ্সা, সরকারী অর্থব্যয়ে ভোগ বিলাসিতা এবং নির্লজ্জভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রবণতা প্রকট।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের এই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিরাজমান সমস্যাগুলি এবারের আলোচ্য।

একশত নব্বই বছরের রাজত্বের শেষে ইংরেজরা ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট এদেশ থেকে চলে যাওয়ার সময় ধর্মের ভিত্তিতে উপমহাদেশে দুটি স্বাধীন দেশের জন্ম হলো- ভারত ও পাকিস্তান। আমরা ছিলাম পাকিস্তানের অন্তর্গত পূর্ববঙ্গ প্রদেশে। এই নতুন দেশে পাকিস্তানের সংবিধান তৈরীতে রাষ্ট্রভাষা সমস্যা দেখা দেয়।

১৯৪৮ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের নড়বড়ে কাঠামোর পর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসকরাও তেরশত মাইল দূরের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষাভাষী জনগণকে চিরতরে দাবিয়ে রাখার ঘৃণ্য চক্রান্তে মেতে উঠে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উষালগ্নেই ঔপনিবেশিক সামরিক আমলা প্রভাবিত প্রশাসন পূর্ব-বাংলার বাঙালীদের মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে চরম অনীহা প্রকাশ করে। সেখান থেকে সারা পূর্ব বাংলায় ক্ষোভ-অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে ভাষা আন্দোলন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের লাগামহীন নিষ্ঠুরতা বাঙালীদের ভাষা সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী আবেগকে প্রবল থেকে প্রবলতর করে তোলে। '৪৮ এর সূচীত ছাত্র আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারীতে বাঙালীদের দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন স্বাধীনতার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৯৭১ সালের স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রমাণ করে '৫২ এর ভাষা আন্দোলন ছিল সত্যিকারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সোচচার বিপ্লব, প্রতিবাদ এবং ভবিষ্যত সংগ্রামের প্রাথমিক পদক্ষেপ।

তারপর '৫২ থেকে '৫৮ পর্যন্ত নানা কূটকৌশল গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি আইয়ুবের ক্ষমতা দখল, শক্ত হাতে দশ বছরের শাসন-শোষণ '৬৯-এর গন অভ্যুত্থান '৭০-এর নির্বাচন এবং নির্বাচনের রায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রের খবরদারী তার আগে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৭১-এর ২৫শে মার্চ গনহত্যা শুরু, বাংগালীর হাতে অস্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ, ৩০ লাখ শহীদ এবং স্বাধীনতা অর্জন। এই হলো আমাদের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

রাজনীতির স্থান সকলনীতির উর্দ্ধে। ইহা অন্যসকল নীতির নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক। রাজনীতি অন্য যে কোন নীতিকে শক্তিশালী করতে পারে

Dhaka University Institutional Repository

আবার ধ্বংসও করতে পারে। রাজনীতি জাতিকে সুসংহত, ঐক্যবদ্ধ করতে এবং জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে পারে। আবার এই রাজনীতিই জাতির মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে হানাহানির সূত্রপাত ঘটাতে পারে, জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করে দিতে পারে। এজন্য যে দেশের রাজনীতি যত সৎ সুষ্ঠু ন্যায়নীতি ভিত্তিক গণকল্যাণমুখী , সে দেশই ততো বেশী উন্নত, গতিশীল, সেই দেশের মানুষ ততো বেশী শান্তি-শৃঙ্খলা উপভোগ করে এবং আত্মন্নোয়নের জন্য নিরলস কাজ করার সুযোগ পায়।

নবগঠিত বাংলাদেশকে ঘিরে সমস্যাগুলি এভাবে নির্দেশ করা যায়ঃ

রাজনৈতিক--

- জাতির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী মতবাদ।
- যে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে অভূত পূর্ব ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা হয়েছিল, সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ও অনুপ্রেরণার দুঃখজনক অবক্ষয়।
- স্বাধীনতার পরপরই জনপ্রতিনিধি কর্তৃক দেশের যে শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়েছিল সেই সর্বসম্মত সংবিধানকে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করে একটি বিতর্কিত দলিলে রূপান্তর করে।
- রাজনৈতিক দল গঠনের অবাধ সুযোগ করে দেয়ায় অসংখ্য নাম সর্বস্ব জনসমর্থনহীন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ।
- গণতন্ত্রের মূলভিত্তি "অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন" কে পদদলিত করে ভোটারবিহীন নির্বাচন, "মিডিয়া ক্যুয় নির্বাচন" ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের প্রাণের দাবী "অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে" প্রহসনে পরিণত করে।
- নির্বাচন উপলক্ষে অর্থের সীমাহীন ছড়াছড়ির মাধ্যমে মানুষকে অর্থলোভী করে তোলা।
- রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে জব্দ করার জন্য দল, ব্যক্তি কর্তৃক মাস্তান বাহিনী পুষে ত্রাস সৃষ্টি করে জনগণকে নির্বাচন বিমুখী করে তোলা।

Dhaka University Institutional Repository

- দলীয় রাজনীতির স্বার্থে গোটা ছাত্র সমাজকে অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের দিকে ধাবিত করে শিক্ষাঙ্গনকে রণাঙ্গনে পরিণত করা।
- ভ্রান্ত স্বার্থান্ধ ও নৈতিকতাবিহীন রাজনীতির কারণে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গণমনে গভীর সন্দেহ ও হতাশার সৃষ্টি এবং দেশ প্রেমের চরম অবক্ষয়।
- রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী জঘন্য অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের দন্ডাদেশ মওকুফ করে সন্ত্রাসের রাজনীতি চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহ প্রদান।
- নতজানু পররাষ্ট্র নীতির জন্য দেশের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে গণমনে গভীর সন্দেহ।
- স্বাধীনতা অর্জনের সাথে সাথে দেশের রাজনীতির মূল গতিধারায় এমন অভাবনীয় গণতান্ত্রিক পরিবর্তন এসে যায় যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত ত্যাগ-তিতিক্ষা পদদলিত করে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা অপব্যবহারের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সেই ভ্রান্ত রাজনীতি আজও সংশোধিত হয়নি।
- বিচার ব্যবস্থার উপরও জনগণের ক্রমাগত অনাস্থা।
- দেওয়ানী মামলার নিষ্পত্তিতে সুদীর্ঘকাল বিলম্ব হওয়ায় সামাজিক জটিলতা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বৃদ্ধি।
- ভূমি প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জনগণের অভিযোগের ওপর সিদ্ধান্তহীনতার জন্য হানাহানি বৃদ্ধি লাভ।
- অর্থ দিয়ে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ক্রয় করে নেয়া অতি সহজ বলে মানুষের ক্রমবর্ধমান ধারণা।

প্রশাসনিকঃ

স্বাধীনতার পর প্রকৃতপক্ষে কোন শাসন আমলেই দক্ষ ও নিরপেক্ষ অসামরিক প্রশাসন গড়ে তোলা হয়নি। প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা যে রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে- এই মূল নীতিটিই বাংলাদেশে স্বীকৃতি লাভ করেনি। প্রশাসনিক সমস্যাগুলি ছিল নিম্নরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

- সরকারী কর্মকর্তাদের ক্ষমতা প্রয়োগের জবাব চিরাচরিত নিয়মাবলী বাস্তবায়ন না করায় তাদের বেপরোয়া ও গণবিরোধী মনোবৃত্তির বিকাশ লাভ।
- প্রশাসনের সর্বস্তরে সিদ্ধান্তহীনতা, গতিহীনতা স্বজনপ্রিয়তা, স্বার্থপরতা।
- সর্বস্তরে সর্বগ্রাসী দূর্নীতির নির্লজ্জ ব্যাপকতায় গোটা প্রশাসনের উপর জনগণের চরম অনাস্থা।
- প্রশাসনে চরম বিশৃংখলা, কর্মকর্তাদের মধ্যে আইন সংগত আদেশ অমান্য করার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা, উচচ পর্যায়ের সরকারী কর্মচারীগণ পর্যন্ত দাবী আদায়ের জন্য বিক্ষোভের পথ অবলম্বন, উচচ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক মাসের পর মাস ফাইল আটকিয়ে রেখে ভূক্তভোগীদের হয়রানি করা- ইত্যাদি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল।
- প্রশাসনিক সমস্যাবলী রাজনৈতিক সমস্যাবলী থেকে উদ্ভূত। রাজনৈতিক সমস্যাবলী জাতির জীবনে অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা, অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে গণজীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অশুভ প্রভাব বিস্তার করে।
- রাজনৈতিক সমস্যাবলী কলুষিত করেছে প্রশাসনকে, ভেঙ্গে ফেলেছে সমাজ ব্যবস্থাকে, লন্ডভন্ড করে ফেলেছে অর্থনীতিকে, যার জন্য কোটি কোটি লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হলেই প্রশাসনিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানের পথ সুগম হবে।

সামাজিকঃ

সামাজিক সমস্যাবলী জন্মলাভ করেছে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক সমস্যাবলীর প্রতিক্রিয়া হিসাবে।

- শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে, যে সমাজব্যবস্থা, সামাজিক বন্ধন, শৃঙ্খলা ও অনুশাসন গড়ে উঠেছিল, সেই সমাজ ব্যবস্থা ক্রমাগত অবক্ষয়ের মাধ্যমে অপমৃত্যুর মুখোমুখি।

Dhaka University Institutional Repository

- মানবিক মূল্যবোধের মারাত্মক অবক্ষয়।
- সমাজে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা, উশৃঙ্খলতা, নিষ্ঠুরতা, অপরাধ প্রবণতার আশংকাজনক বৃদ্ধি।
- মাদকাশক্তির উদ্বেগজনক বৃদ্ধিতে যুবশক্তির পথভ্রষ্টতা।
- শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যকর অবস্থা ও সর্বজনীন দূর্নীতি। উচ্চস্তরের শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশের কারণে টাকার ছড়াছড়ি, আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ ও অস্ত্রযুদ্ধে খুনাখুনির প্রচলন।
- পারস্পরিক সৌহার্দ্রের দ্রুত অবক্ষয়।
- দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা দীর্ঘকাল অমীমাংসিতভাবে ঝুলে থাকার জন্য বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে অনেক ক্ষেত্রে বংশানুক্রমে কলহ দ্বন্দ্ব বিরাজ করায় সামাজিক অশান্তি এবং বহুক্ষেত্রে বংশ পরম্পরায় প্রতিশোধমূলক হাঙ্গামা-হত্যা।
- দেশে ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা, নিষ্ঠুর, পৈশাচিক, হিংস্র মনোবৃত্তির প্রসার, যার পরিস্থিতিতে প্রতিপক্ষকে নারকীয়ভাবে নির্বংশ করার প্রবণতা।
- দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় চরম অবনতি।
- ভিক্ষাবৃত্তিকে স্থায়ী জীবিকা হিসেবে গ্রহণ।
- জানমালের নিরাপত্তার অনিশ্চয়তার জন্য গণমনে সার্বক্ষনিক আতঙ্ক।
- নৃশংস খুন, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে ডাকাতি সহ নিষ্ঠুর দূর্ধর্ষ, রাহাজানি, হাইজ্যাক, বলপ্রয়োগে অপহরণ করে ধর্ষণ এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি।
- জঘন্য অপরাধের অপ্রতুল তদন্ত ব্যবস্থা অপরাধ তদন্তে ক্ষমতাসীনদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ।
- পারিবারিক সৌহার্দের অভাব বা পারিবারিক অশান্তি, যার ফলে ছেলে মেয়ে বিপথ গামী হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি।

Dhaka University Institutional Repository

- প্রায় প্রত্যহ দেশের কোন কোন স্থানে অবরোধ, হরতাল-ধর্মঘট, বিক্ষোভ ইত্যাদির জন্য সাধারণ মানুষের জীবিকা অর্জনে বাঁধার সৃষ্টি ও লক্ষ লক্ষ কর্মঘন্টা বিনষ্ট।
- এমন কিছু সামাজিক প্রথা বিরাজ করছে যেগুলো মানুষকে অবৈধ আয়ের সন্ধান করতে বাধ্য করে। জন্ম উপলক্ষে, জন্মবার্ষিকীতে, জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান, মৃত্যু বার্ষিকীতে ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান, বিবাহ উপলক্ষে মাত্রাতিরিক্ত শানশওকত প্রদর্শনী, অতিমূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার এর প্রতি অপরিসীম আসক্তি ইত্যাদির জন্য সারাদেশে যে পরিমাণ অপচয় হয় তা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তশালী পরিবারের অর্থনৈতিক ধ্বংসের কারণ।

অর্থনৈতিক ঃ

- নিম্ন মাথাপিছু আয় এবং জাতির মাথাপিছু আয় বাঁচানোর বিকল্প চিন্তা-ভাবনা পরিকল্পনা অনুপস্থিত।
- খাদ্য ঘাটতি, দেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণের প্রতিশ্রুতি ও প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও এবং বছর বছর খাদ্য উৎপাদনে কিছুটা উন্নতি হলেও দারিদ্র ও বেকারত্ব বিমোচনের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না।
- দেশের মৌলিক সম্পদ 'ভূমির' যথেচ্ছ অপচয় "ভূমির" সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার-এর কোন পরিকল্পনা ছিল না।
- বন্যা, প্লাবন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দূর্যোগের আঘাত এড়িয়ে পরিকল্পিত চাষাবাদের বিকল্প ব্যবস্থার অনুপস্থিতি।
- প্রাকৃতিক দূর্যোগের আগাম সতর্কীকরণ জনগণকে প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় প্রশিক্ষণ এবং দূর্যোগ মোকাবিলায় অপর্যাপ্ত প্রতিবিধান।
- বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক প্রযুক্তিগত চাষাবাদের অভাব।
- পশু সম্পদের অনগ্রসরতা।
- প্রচুর সম্ভাবনাময় মৎস সম্পদের উন্নয়নের অপ্রতুল ব্যবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

- দেশের প্রাচীনতম রপ্তানী সম্পদ 'পাট' এর অনিশ্চিত আন্তর্জাতিক বাজার এবং পাট ফলগুলোর ব্যবস্থাপনায় দূর্নীতি ও বিভিন্ন জটিলতার কারণে পাট চাষীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।
- মেশিনটুলস ফ্যাক্টরী, জিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী, আদমজী জুট মিলের মতো প্রায় সকল বৃহৎ শিল্পই বছরে কোটি কোটি টাকা লোকসান দিয়ে জাতির উপর অর্থনৈতিক বোঝা হিসেবে চেপে আছে। এসব লোকসানমুখী শিল্পকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার অপ্রতুল প্রচেষ্টা।
- দেশের প্রায় দুই হাজার রুগ্ন ক্ষুদ্র শিল্প সুদীর্ঘ কাল থেকে অচল অবস্থায় পড়ে থাকায় অপূরণীয় ক্ষতি এবং ঐ সব শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের বেকারত্ব বরণ।
- যথেষ্ঠ পরিমাণ জামানত ছাড়াই শিল্প স্থাপনের জন্য বিরাট অংকের ঋণ নিয়ে মূলধন আত্মসাৎ করার প্রবণতা।
- শিল্পখাতে বাংলাদেশের লজ্জাকর ব্যর্থতার কার্যকারণ নির্ধারণ, দায়-দায়িত্ব নিরূপন ও প্রতিশোধক ব্যবস্থা গ্রহণে অনীহা।
- বিশ্বের দরিদ্রতম এই দেশে অঢেল স্বর্ণালংকারের সমাগম ও ব্যবহারের প্রদর্শণী ভারসাম্যহীন অর্থনীতির পরিপূরক।
- সর্বোপরি কোটি কোটি সর্বকালীন ও খন্ডকালীন বেকার নারী-পুরুষের কর্মসংস্থানের কোন পরিকল্পনা ছিল না।
- সবচেয়ে বেশী মূল্য সংযোজন করেছে যে ক্ষুদে ও কুটিরশিল্প, সেসব খাতের প্রতি নজর ছিল না। এসব খাতের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ, বাজারজাতকরন করার বদলে নির্লিপ্ততাই ছিল লক্ষণীয়।

দেশে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য, একদিকে অফুরন্ত সম্পদ, আর অন্যদিকে চরম দারিদ্র-এই দুঃখজনক পরিস্থিতি একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এর জন্য কোন একটি সরকার বা কোন একটি রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীকে দায়ী করা যাবে না। এর জন্য ১৯৪৭ সালের প্রথম স্বাধীনতার পর থেকে ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের বাস্তবায়নে মারাত্মক

Dhaka University Institutional Repository

ভুল ভ্রান্তিকে দায়ী করা যায়। তবে মূল দায়িত্ব গিয়ে বর্তায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ক্রমাগত ভ্রান্তিমূলক রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের উপর।

মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি যেমন সাংস্কৃতিক জীবনের অনিবার্যতাকে অবজ্ঞা করা যায় না তেমনি তার নৈতিক জীবনের যে আবহমন্ডল গতি প্রকৃতি সেটাও নির্ধারিত হয়ে থাকে মানুষের আত্মিক বিবেচনার মধ্য দিয়ে। এই আত্মিক বিবেচনার অভাব ঘটলে বিপর্যয় দেখা দেয় জীবনের সমস্ত পরিসরে। আমাদের সাংস্কৃতিক সৌধও ধ্বসে পড়ে। দূর্দশাগ্রস্ত হতে থাকে সমাজের মানুষেরা।

সভ্যতা ও প্রগতি মানুষের মূল্যবোধেরই বহিঃপ্রকাশ। এই মূল্যবোধ মানুষের মৌলনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সমাজ ও সংস্কৃতি ছাড়া মানুষের সভ্যতা ও অস্তিত্বহীন ও অবাস্তব বলে প্রতিভাত হয়। রাজনীতিতে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয় অনিবার্য রুপে। আমাদের দেশে রাজনীতি এগিয়ে চলেছে সংস্কৃতিকে পিছনে ফেলে তাতে আসলে আগাতে পারেনি, আগানোর চেষ্টা করেছে মাত্র এবং সংস্কৃতিও বিকশিত হতে পারেনি- যে গণতান্ত্রিক ধারায় তার অগ্রযাত্রা কাঙ্খিত ছিল সে ধারায়। সংস্কৃতিতে পুঁজিবাদী তৎপরতা ক্রমবর্ধমান। সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছে ভিক্ষা ও ঋণ। ভিক্ষা ব্যক্তিগত ছিল এখন তা রাষ্ট্রায়ত্ব হয়ে দাড়িয়েছে। ব্যাপ্ত হয়েছে সর্বত্র। বিজাতীয় সংস্কৃতির আধিপত্য বেড়ে গিয়েছে। সীমান্তের ওপার থেকেও নানা রকম বই পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা, ফিল্ম ইত্যাদির এদেশে আসার মাধ্যমে নানা রকম বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

চলচিচত্র একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। বিনোদন মাধ্যমও এটি। এর মাধ্যমে জনসাধারন সমাজ উন্নয়নমূলক, শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক নানা বিষয় উপভোগ করে থাকেন। সমাজের শিক্ষিত লোক, বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিবিদ তথা সচেতন শ্রেনীর দর্শক হলে গিয়ে ছবি দেখেন না। অথচ একসময় সমাজের সচেতন শ্রেনীর লোক সহ সর্বস্তরের লোক ছবি দেখতেন। ১৯৭১ সালের পর থেকে আমাদের চলচিচত্রে নামতে থাকে নৈতিক অবক্ষয়ের ধ্বস। স্বাধীনতার পর'রংবাজ' ছবির মাধ্যমে শুরু হয় মারদাঙ্গা ছবির ধারা। এক শ্রেনীর দর্শকও লুফে নেয় এসব ছবি। কিন্তু যারা ছিল মূল দর্শক অর্থাৎ মধ্যবিত্ত

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেনী, তারা ঐ সব ছবি প্রত্যাখ্যান করে। এর জন্য দায়ী নির্মাতারা। তারা তাদের মেধার সঠিক মূল্যায়ন না করেই শুধু ব্যবসার জন্য ছবি নির্মাণ করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, দারিদ্র অশিক্ষা, কুসংস্কারমুক্ত আধুনিক রাষ্ট্র চেয়েছি বাঙালি হয়ে, বাঙালি থেকে। শিক্ষার পর একজন মানুষের গড়ে উঠা, বিশেষত তার সাংস্কৃতিক প্রবণতা, রুচি, মান এসব নির্ভর করে সেখানে বাংলা সাহিত্য, বাংলা ভাষা, বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্য। বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার অবকাশ নেই বললেই চলে।

শহরে শহরে গজিয়ে উঠেছে ইংরেজী মাধ্যম স্কুল। পশ্চিমা মিডিয়া প্রচারিত ধ্যান-ধারণার অনুকরণ চলছে, বিদেশী আবহে রচিত শিশু পাঠ্য বই শিশুর মনে স্বদেশকে জানার কোন আগ্রহ জাগাতে পারেনা। মূল ধারার বাংলা মাধ্যমের স্কুলেও দেশপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ এদেশের ইতিহাস-সংস্কৃতি জানার পরিবেশ তৈরী হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাংলা পড়তে আগ্রহী না হওয়ার কারণ সামাজিক মর্যাদা না পাওয়া ও চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া।

ইংরেজী শেখার গুরুত্ব কোনভাবে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নিম্ন পর্যায়ের সম্পূর্ণ শিক্ষা ইংরেজী মাধ্যমে করা এবং ইংরেজীয়ানা শেখার বিরোধিতা করা উচিত। আমাদের সরকারি স্কুলে বাংলা-ইংরেজী শিখতে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত কোনো অসুবিধা ছিল না। স্বাধীনতার পরে আমাদের সকল ক্ষেত্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে।

স্কুল-কলেজে ছেড়ে শিক্ষা চলে গিয়েছে কোচিং সেন্টারে ও প্রাইভেট টিউশনে। সেখানে বিপুল টাকা গুণে শিখতে হয়, প্রায় একই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কাছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের লক্ষ্য, অঙ্গীকার এবং পরিবেশ তিন-ই হারিয়েছে। এই নৈরাজ্যের সুযোগে শূন্যস্থান পূরণে এগিয়ে এসেছে সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক বুদ্ধিতে সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। বিদ্যা আর যাই হোক কেনাবেচার পণ্য নয়, এটি কর্ষণ-অনুশীলণের বিষয়। সঠিক সাংস্কৃতিক ভূমিতেই বিদ্যার বীজ ফলবতী হয়।

কৃষি বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ বাঁচিয়ে রাখে। আমাদের এই অর্থনীতি খুবই প্রকৃতি নির্ভর। বন্যা ও খরার কারণে কৃষি উৎপাদন অস্থিতিশীল। সার ও কীটনশক ব্যবহারের কারণেও জমির উর্বরতা কমে

Dhaka University Institutional Repository

যাচেছ। কৃষির এই নাজুক হাল মোকাবেলা করার মতো শিল্পায়নের ভিত্তিও নেই দেশে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে খাদ্য বহির্ভূত ফসলের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে মাত্র ০.৩ শতাংশ হারে। ক্যাশক্রপ বা বাণিজ্যিক ফসলের মধ্যে পাটের যে অবস্থান ষাটের দশকে ছিল, স্বাধীনতা উত্তরকালে সেটা ধরে রাখা যায় নি। কৃষিখাত প্রতিবছর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে ১.৪ হারে।[৯] তা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক নতুন শ্রমমুখ এখাতে আর ঢুকতে পারেনা। যাওবা ঢুকেছে তারা কম মজুরিতে অনিশ্চিত পরিবেশে কাজ করছেন। আর দীর্ঘ দিন কৃষি এ বোঝা বইতে পারবে বলে মনে হয় না। কৃষি বহির্ভূত খাতের অগ্রগতি না ঘটলে আগামীতে শুধু বেকারত্ব বাড়তে থাকবে।

দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় যখন শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি জি ডি পি-র শতকরা ১০ ভাগের ওপরে,[১০] মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ে বাংলাদেশে সে হার কোন অবস্থাতে শতকরা ৪/৫ ভাগের বেশী হতে পারেনি। প্রতিটি পরিকল্পনায় লক্ষ্য মাত্রার শতকরা চল্লিশ ভাগের বেশী হতে পারেনি। মূলত বিনিয়োগের পরিবেশ নেই বলেই যে শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি কাঙ্খিত হারে হচেছ না, সে কথা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। পাট ও বস্ত্র শিল্পের বিপর্যয়ের কারণেই মূলত শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ যেমন বেশী, এর বিতরণের সময় যে অপচয়, তারও পরিমাণ বেশী। মুদ্রাস্ফীতি সামান্য সত্ত্বেও বিদ্যুতের দাম বেড়েছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে ১৬% হারে। আমাদের রেল লাইন ছিল ২৭৪৬ কিঃ মিঃ। স্বাধীনতা-উত্তরকালে আমরা মাত্র ৩৪ কিঃ মিঃ রেলপথ বাড়াতে পেরেছি। সড়কপথে অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য হলেও এর উন্নয়ন ঘটেছে ভারসাম্যহীনভাবে। জলপথের বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও এদিকে তেমন নজর দেয়া হয়নি।

---

৯. শিল্পায়ন ও উন্নয়ন বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, *নির্বাচিত প্রবন্ধ* সংগ্রহ থেকে। পৃঃ ৩৭২

১০. শিল্পায়ন ও উন্নয়ন বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, *নির্বাচিত প্রবন্ধ* সংগ্রহ থেকে, পৃষ্ঠা ৩৭১।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক খাতে আমাদের অর্জন খুবই দুঃখজনক। আমাদের স্বাক্ষরতার হার শতকরা ৩২.৪ ভাগে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রাথমিক স্কুলে যাবার উপযোগী শিশুদের ৭৫% স্কুলে ভর্তি হলেও পঞ্চম শ্রেনীতে ওঠার আগেই এদের দুই তৃতীয়াংশ ঝরে পড়ে। মাধ্যমিক স্কুলে যাবার উপযোগী ছেলেদের ৩৮.৯% এবং মেয়েদের২৫.৫% স্কুলে যায়।[১১] উচচ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপুল বৈষম্য শতকরা ৫০ ভাগ মানুষের সন্তানেরা উচচ শিক্ষার সুযোগ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত। প্রযুক্তি নির্ভর উচচ শিক্ষার মান খানিকটা ধরে রাখা গেলেও সাধারণ উচচ শিক্ষায় শিক্ষিত স্নাতকরা মোটেও ব্যবহার উপযোগী নয়। তাছাড়া শিক্ষাখাতে যে চরম বিপর্যয় ঘটেছে তার প্রমাণ লক্ষাধিক তরুণদের পড়শি দেশ, পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা। আর প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায়ই ঘটছে সন্ত্রাস।

স্বাস্থ্যখাতের অর্জনও সন্তোষজনক নয়। প্রতি ৩২৮৮ মানুষের জন্য হাসপাতালে একটি শয্যা ব্যবস্থা, প্রতি ৪৯৫৫ জনের জন্য একজন ডাক্তার। মাত্র ১৩% মানুষ হাসপাতালগত স্বাস্থ্য সুবিধা পান যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অল্প।[১২]

যেহেতু বিনিয়োগ বাড়েনি কাঙ্খিত হারে তাই প্রতিটি পরিকল্পনা মেয়াদ শেষেই কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধিও ঘটে আশাব্যঞ্জক হারে। বেকারত্বের মতোই দারিদ্র পরিস্থিতিও এক অসম্মানজনক অবস্থায় রয়ে গেছে দারিদ্র্যের মাত্রা বেড়েছে। প্রান্তিক চাষীদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে। ধান-চালের দাম পড়ে যাওয়ায় এবং এর উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিশেষ করে কৃষকদের মধ্যে সংকট বেড়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচাইতে বড় দূর্বলতা ছিল সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অত্যন্ত নিম্নহার। বৈদেশিক মুদ্রার ক্রমবর্ধমান রিজার্ভ ও মুদ্রাস্ফীতির নিম্নহার অর্থনীতিতে বিরাজমান সামগ্রিক চাহিদার দূর্বলতাকেই নির্দেশ করে। প্রধানতঃ বিনিয়োগের স্বল্পতা থেকে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

---

১১. *সেলফ অ্যাসেসমেন্ট*, মে ১৯৯৮- পৃষ্ঠা ১(বাংলাদেশ বিষয়াবলী) বি.সি.এস গাইড

১২. *সেলফ অ্যাসেসমেন্ট* (সংযোজনী) বি.সি.এস গাইড, ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি বা শিল্প যেটাই হোক না কেন, আমাদের নিজস্ব সম্পদের যোগান সহ বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, তা না হলে বিদেশী সাহায্যের ওপর আমাদের নির্ভরতা কমবে না। এর জন্য অবশ্য বিনিয়োগ ও সঞ্চয় বাড়াতে হবে। বিদেশী সাহায্যে দিনের পর দিন গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সন্ধান করার কোন মানে হয় না । যেসব বাধা বিনিয়োগ বাড়াতে দেয় না সেগুলির কয়েকটি নিম্নে উল্লেখিত হলোঃ

(১) মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে সকলের জন্য গ্রহনযোগ্য একটি নিয়মনীতি গড়ে উঠেনি বলে অর্থনৈতিক নীতি কৌশলেও কোন স্থিতিশীলতা আসেনি। রাজনীতির ধরণটাই এমন যে অর্থসঞ্চয় আর উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক নেই। জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রীয়করণ উভয় নীতি কৌশলেই রাজনৈতিক বিবেচনাই মূখ্য হবার কারণে এ প্রক্রিয়ায় সঞ্চিত অর্থ উৎপাদন কর্মকান্ডে নিয়োজিত হয়নি।

(২) "বিনিয়োগের চাইতে ব্যবসা ভাল"-- এই বিশ্বাস সমাজে দৃঢ়মূল হয়ে গেছে। অবশ্য ঋণ ও অন্যান্য সুবিধা বন্টনের সময় প্রকৃত উৎপাদক অপেক্ষা করার কারণেই এমন মনোভাব পোক্ত হয়েছে।উল্লেখ্য, ক্ষুদে উদ্যোক্তারা সবচেয়ে বেশী মূল্য সংযোজন করলেও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সিংহভাগ গেছে খেলাপি বড়ো শিল্পপতিদের কাছে।

(৩) রাজস্ব সংগ্রহ, ঋণ বন্টন, রপ্তানি সুবিধা সকল ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নিয়মনীতির বদলে রাজনৈতিক কিংবা আমলাতান্ত্রিক বিবেচনা প্রাধান্য পাবার কারণে প্রকৃত উদ্যোক্তা শ্রেনীর মনে আস্থার ভাব সৃষ্টি করা যায়নি।

(৪) আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক নীতি বিশ্লেষণে সফলতা ও সক্ষমতা বাড়ানো যায়নি বলে বিনিয়োগ বাড়ে নি।

(৫) সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির কারণে আইন শৃঙ্খলার অবনতি দেশীয় বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করেছে। আর দেশী বিনিয়োগ না বাড়ার কারণে বিদেশী বিনিয়োগও বাড়েনি। বিশ্বব্যাংক বলেছে, বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ চাহিদার ব্যবধান কমাতে আগামী বিশ বছরে ছয় হাজার কোটি ডলার বৈদেশিক অর্থায়নের প্রয়োজন হবে।[১৩] কিন্তু মধ্যবর্তী মেয়াদে সরকারী এবং

---

১৩. প্রথম আলো, ১৮ই নভেম্বর, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

খাতভিত্তিক সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন না করলে দেশটির জন্য বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা আরো কমে যাবে।

অর্থনৈতিক সংস্কৃতিতে নীতি নৈতিকতা না থাকায়, পুঁজির স্বাভাবিক বৈধ বিনিয়োগ না হওয়ায় নতুন নতুন শিল্প-কারখানা হয়নি এমনকি পুরনো শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থাও হয়ে পড়েছে নাজুক। এভাবে একটা দীর্ঘ সময় ধরে নতুন কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় দেশে বেকারত্বের মাত্রা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এ অবস্থা দেশের বনেদী ও সৎ শিল্পপতিদের মধ্যে যেমন ক্ষোভ ও হতাশার জন্ম দিয়েছে তেমনই উদ্যমী ও সৃজনশীলতায় উদ্যোক্তাদেরও ঠেলে দিয়েছে স্থবিরতার দিকে।

যুদ্ধোত্তর সময়ে জন চাহিদার তুলনায় রাষ্ট্রের রূপায়ন ক্ষমতা ছিল সীমিত। তাছাড়া খুব দ্রুতই বাংলাদেশের শাসক শ্রেনী সাধারণ মানুষের আকাংখা থেকে দূরে সরে আসতে শুরু করেন সমাজের প্রচলিত স্বার্থদ্বন্দ্বের কারণে। তদুপরি সে সময় ছিল বাইরের চাপ, অভিজনদের মধ্যে চলছিল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। ছিল যুদ্ধে হেরে যাওয়ায় প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্র। সবকিছু মিলে খুব দ্রুত উবে যেতে থাকে আত্মনির্ভর বাংলাদেশের স্বপ্ন। বিদেশী সাহায্যের পুরনো লাগাম লাগিয়ে দেয়া হয় যুদ্ধ জয়ী একটা জাতির মুখে। ক্রমেই আরো পিছু হটতে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের মৌল আকাঙ্খা থেকে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রথাসিদ্ধ প্রশাসন প্রথাসিদ্ধ কায়দায় কব্জা করে ফেলে দেশ পরিচালনার প্রক্রিয়াকে। 'অপহৃত' হয়ে যায় একাত্তরের বাংলাদেশ। আশাহত হয় মুক্তিযোদ্ধারা ও তাদের নেতৃত্ব।

আত্মনির্ভরতার স্বপ্ন নিয়ে জন্ম নিয়েছিল যে দেশ সে দেশটি পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে বিদেশী সাহায্য ও ভাবনার ওপর। মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা প্রায় আট ভাগ বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। মোট জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশী পরিমাণ বিদেশী দেনা। এই দেনার সুদ দিতেই রপ্তানী আয়ের এক তৃতীয়াংশ খরচ হয়ে যায়।

বিপুল অঙ্কের এই বিদেশী ঋণ পেয়েও আমাদের 'দারিদ্র' অবস্থার মোটেই উন্নতি করতে পারিনি, বরং দারিদ্র বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার সামনে এক বিরাট জগদ্দল পাথরের মতো চ্যালেঞ্জ হিসেবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হলেও আমরা সকলেই পরনির্ভর সুতোয় বাঁধা পড়ে

Dhaka University Institutional Repository

গিয়েছি। কেননা আন্তর্জাতিক অর্থানুকূলে দেশের উন্নয়নের কার্যকলাপ চলছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছে তার এক কানাকড়িও ঐ দারিদ্র পীড়িত, অর্ধাহারে, অনাহারে, অপুষ্টিতে জর্জরিত জনগোষ্ঠীর হাতে গিয়ে পৌঁছায় না । বরং উন্নয়নের নির্মাণাদি কাজে সংশ্লিষ্ট বিত্তশালী লোক সম্পদ সম্প্রসারণের সুযোগ পাচেছ। এসব লোকের বাড়তি আয়ের জন্য ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে, যার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়েই চলেছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা কমছে।

স্বাধীনতা লাভের পর আওয়ামী লীগ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে যথেষ্ঠ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হলেও সেই সাফল্য ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারেন নাই। বস্তুত এই সাফল্যের পাশাপাশি তৎকালীন সরকার শাসনামলের নীতিগত ত্রুটি, প্রশাসনিক দূর্বলতা, নৈতিক অবক্ষয়, সেনা-বিদ্বেষ, হতাশা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, আইন শৃঙ্খলা অবস্থার অবনতি প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যা প্রকট হয়ে উঠে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন থাকাকালে উক্ত সমস্যাগুলি সমাধানে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। এমতাবস্থায় এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এর পতন ঘটে।

তথাকথিত সবুজ বিপ্লব, অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঋণ বিতরণ, আমদানীকৃত প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পায়ন, সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা অনুযায়ী বুর্জোয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপকাঠামোকে দৃঢ়বদ্ধ করা যোগাযোগ ও গ্রাম পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেনী নিজেদের অঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলেও সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলাকে বিস্তৃত করেছিল।

সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশে এসেছিল ঔপনিবেশিক বিজয়ীর বেশে। তাই তার অভিযানের প্রধান ফলও দাঁড়ায় পুরনো সমাজেরই ভাঙনে; নতুনের সৃষ্টি নয়। পুঁজির ক্ষমতা এখানে স্বদেশী শক্তির উদ্ভবে না হয়ে যেহেতু আবির্ভূত হয় বিদেশী ঔপনিবেশিক ক্ষমতার অবয়বে তাই তা দেখা দেয় অতিশয় নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু রূপে। পুঁজিবাদী উৎপাদন গড়ে উঠার আগেই দেশ চলে যায় আন্তর্জাতিক পণ্য মুদ্রাবিনিময় সম্পদের আওতায়। বুর্জোয়া

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আগেই চিরাচরিত অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভাঙন জনগণের পক্ষে অসাধারণ সর্বনাশা ও যন্ত্রনাদায়ক হয়ে উঠে।

বাংলাদেশে এন. জি.ও মডেল চর্চার বয়স বিশ বছর পার হতে চললো। গ্রামীণ সমাজে ঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকারী বেসরকারী অর্থসংস্থানের কাঠামোগত দূর্বলতা এন.জি.ও অনেক দুর করেছে এবং একই সঙ্গে গ্রামের মহাজনদের আধিপত্যকেও দূর্বল করেছে। এন.জি.ও গুলো যেহেতু তাদের কর্মকান্ড দেশের সমস্ত থানা, জেলা, বিভাগ ও রাজধানীতে বিস্তৃত করেছে। সে ক্ষেত্রে ট্রেনিং প্রদান, আর্থিক সহায়তা প্রদান ও কুটির শিল্পের পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে ব্র্যাক, কারিতাস ইত্যাদি সংস্থাগুলো ইতিমধ্যেই সাফল্য অর্জন করেছে। ত্রাণ বিতরণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এনজিও বিদ্যমান। অদক্ষ দূবর্ল রাষ্ট্রের কাঠামোগত অসম্পূণর্তা পূরণ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। গতিহীন এই অর্থনীতিতে এনজিও এখন মধ্যবিত্ত তরুনদেরও বড় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র।

এনজিওগুলো বেসরকারী সংস্থা কিন্তু বে-রাষ্ট্রীয় সংস্থা নয়; অর্থাৎ এনজিও (নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন) অতি অবশ্যই এনএসও (নন-ষ্টেট অর্গানাইজেশন) নয়। একই সঙ্গে এসব সংস্থা বহুজাতিক সংস্থা যে বৃত্তে নড়াচড়া করে, তার থেকেও আলাদা নয়। বাজার থেকে বিচ্ছিন্নতো নয়ই। বাংলাদেশের বৃহৎ এনজিওগুলো বাজারের ক্রমবর্ধমান অংশীদার।

বস্তুত এনজিও দুই ক্ষমতার সংগে যুক্ত একটি হচেছ তহবিল যোগানদার বিভিন্ন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র সমর্থিত আন্তর্জাতিক সংস্থা। অন্যটি হচেছ নির্দিষ্ট রাষ্ট্র যার অধীনে এটি কাজ করছে। বর্তমানে এনজিও তহবিল যোগানদারদের প্রধান ধারাটি হচেছ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় সংস্থা যেমন ইউএসএইড, সিডা, নোরাড, ইত্যাদি। এরপর আছে বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা। এছাড়া আছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ত্রাণ সংস্থা যেগুলো আবার নিজ নিজ দেশের আইন অনুযায়ী সেসব দেশের সরকার, বহুজাতিক সংস্থা, দেশী বৃহৎ ব্যবসায়িক গ্রুপ ও ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। অর্থাৎ বাংলাদেশের এনজিও তহবিলের দিক নিজ নিজ দেশের রাষ্ট্রের সঙ্গে না হলেও বিশ্বের পুঁজিবাদী কেন্দ্র রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত। অন্যদিকে কাজ করবার দিক থেকে এনজিও আবার নিজ দেশের রাষ্ট্রের

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ন্ত্রণে, তার পরিকল্পনা, বিধি বিধানের, অধীনেই কাজ করে। ইদানিংকালে রাষ্ট্রের সঙ্গে এনজিও'র অঙ্গীভবন আরও স্পষ্ট হচেছ বিশেষত অভিন্ন তহবিল যোগানদানের কারণে। তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কর্মসূচী জন্মনিয়ন্ত্রণ, ত্রাণ তৎপরতা, দারিদ্রবিমোচন ইত্যাদি বাস্তবায়নকে এনজিওগুলো বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বব্যাংকও এই পদ্ধতিতে বেশী আগ্রহী। অনেক ক্ষেত্রে তাই এটা বলা যায় যুক্তিসংগত যে, এনজিও প্রধান ধারা এখন রাষ্ট্র এবং সেই সঙ্গে সরকারের সাব-কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশের জনগণ একদিকে দেশীয় এবং অন্যদিকে বিদেশী ও সাম্রাজ্যবাদী নানান শক্তির শোষক ও লুণ্ঠনকারী দ্বারা শোষিত ও নির্মম ভাবে তাদেরই পদানত। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলন দেশীয় ও সাম্রাজ্যবাদী শোষক শাসকদের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।

দেশের সীমানা দিয়ে চোরাই পথে অবৈধভাবে মালামাল ও সম্পদ আদান-প্রদান অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আর একটি অন্যতম কারণ। সর্বনাশা এই চোরাকারবার বন্ধ করবার জন্য বি.ডি.আর বাহিনী দ্বারা সীমানা পাহাড়া দেয়া ছাড়া আর কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হয় নাই যদিও একথা অনস্বীকার্য যে এত বড় স্থল ও নৌ-সীমানা কেবল পাহারা দিয়ে এইসব অবৈধ কাজ পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয়। এই চোরাই পথে বিদেশী মালামাল অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করার ফলে দেশী শিল্পের উৎপাদিত মালামাল বাজারে বিক্রি হয়না, ফলে অনেক শিল্প কারখানা ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছে, নতুন বিনিয়োগের আগ্রহ থেমে গেছে, বেকার সমস্যা প্রকট হয়ে দারিদ্র্যের কষাঘাত আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের একটি অন্যতম সমস্যা ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। স্বাধীনতার পর পর জনসংখ্যা বেড়েছে বছরে তিন শতাংশ হারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমান্তরালে বলা যায় পাল্লা দিয়ে বেড়েছে কর্মহীনতা। জনসংখ্যার মহাচাপে সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিপন্ন হওয়ায় ইহাকে দেশের 'এক নম্বর সমস্যা' হিসেবে চিহ্নিত করে ইহার সমাধানে জন্মহার বিশেষ ভাবে হ্রাস করার জন্য জরুরী কর্মপন্থা গ্রহণ করলেও সেটা শহরের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার জন্য উচচ ও উচচ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মহার হ্রাস

Dhaka University Institutional Repository

পায়। কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জন্মহার তেমন হ্রাস পায়নি বরং দরিদ্র ও অতি দরিদ্রের জন্মহার অতি মাত্রায় বেড়ে যায়। ফলে সমাজে জনসম্পদের চেয়ে জনসমস্যা আরও তীব্রতর হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের দুঃখ-দূর্দশার অন্ত ছিল না। কারণ দ্রব্যমূল্য তাদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে ছিল।

স্বাধীনতার পরেও বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল। ফিনল্যান্ড, স্পেন, ইতালী এমনকি জাপানও এক কালে দরিদ্র দেশ হিসেবে জাতিসংঘের সাহায্য পেত। আজ তারা সাহায্যদাতা দেশ। এই দারিদ্র ব্যূহ থেকে বের করে বাংলাদেশকে সঠিক পথে স্থাপন করার সরকারী পদক্ষেপ শুধু অপ্রতুলই ছিল না বরং সরকারও দারিদ্র সৃষ্টি ও বন্টনে কম ইন্ধন যোগায়নি। মাঝে মাঝে নতুন ফরমান জারি করে উন্নয়নের মূলে কুঠারাঘাত করেন অথবা গদি হারানোর ভয়ে চরম বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংস প্রশমনে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থেকে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। ফলে অরাজকতা ও নৈরাজ্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

গুটিকয়েক ঋণ খেলাপির হাতে জিম্মি দেশের অর্থনীতি। এই ঋণ খেলাপিদের দৌরাত্ম এতোটাই সর্বসংহারী রূপ নিয়েছে যে সমাজে এদের পরিচিতি দাঁড়িয়ে গেছে অর্থনৈতিক সন্ত্রাসী হিসেবে তাছাড়া বৈষম্যমূলক নীতিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহিত করার কারণে সমাজে শুধু খেলাপি ঋণ নয়, আরো অনেক সমস্যাই সৃষ্টি হয়েছে।

স্বাধীনতার নায়কদের রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে ফেলার আগ থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের উন্নয়ন আকাঙ্খার বিপরীত স্রোতধারা। তৈরী করা হয়েছিল এমন সব রাজনৈতিক বিভক্তি, বিভ্রান্তি ও ষড়যন্ত্র, যার কারণে জাতি তার পরীক্ষিত নেতৃত্বের অবদান থেকে বঞ্চিত হয়। দুঃখের দিনের জড়াজড়ি করে গড়ে উঠা নিরাপদ জীবনের স্বপ্নকে যে নেতৃত্ব সফলভাবে লালন করতে পারতেন, তাদের অবদমন বা নিঃশেষ করার পর থেকে শুরু হয়েছে জাতির উল্টো পদযাত্রা।

সরাসরি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কারণে মৃত্যু ঘটলে এখানে সুবিচারের বিশেষ সম্ভাবনা নেই এবং এই সম্ভাবনা না থাকার জন্য এই সন্ত্রাসের প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতে মৃত্যু হয়েছে শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী, কর্ণেল তাহের, জিয়াউর রহমানের মত নেতাদের।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও জাতি প্রশ্ন নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা হয়নি এবং যেখানে বাঙালী শাসক শ্রেণীর আত্মপরিচয়ের সমস্যার সমাধান হয়নি, সেখানে উপজাতিগুলোর সমস্যা সমাধানের কোন প্রশ্নই শাসন কাঠামোর মধ্যে ছিল না। বাংলাদেশে সামগ্রিক ভাবে বুর্জোয়া শ্রেনী তাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে রাখে। এদেশে শ্রমিক-কৃষকেরা জাগ্রত রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ না করায় তারা তাদের বিরোধী শ্রেনী শক্তি পুঁজিবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাবের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। নির্বাচন এলে তারা পুঁজিবাদী দলগুলিকেই ভোট দেয় এবং পুঁজিবাদী দলগুলির সভা-সমিতিতে যোগদান করে নিজেদের বিরুদ্ধে শক্তির হাত জোরদার করে নিজেদের সর্বনাশ করে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধর্মীয় মৌলবাদের দ্বারা আক্রান্ত। এই মৌলবাদ[১৪] যে শুধু বেড়েছে তা নয়, আমাদের জীবনের সমগ্র গতিধারাকে প্রভাবিত করছে। বিশেষভাবে রাজনীতিতে ধর্মীয় মৌলবাদী তৎপরতা ও প্রক্রিয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। এর ফলে সমাজ জীবনের সৃষ্টি হয়েছে আন্তঃজাতি বিভেদ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। বৈষম্য, হতাশা, চরম অনিশ্চয়তা, মানুষের নিরাপত্তাহীনতা, আতঙ্ক, সন্ত্রাস এবং সর্বোপরি বিচ্ছিন্নতা। সামাজিক শান্তি, সম্প্রীতি ও মানুষের সহবস্থানের পথে প্রধান অন্তরায় মৌলবাদ। বাংলাদেশের বাস্তবতায় ধর্মীয় মৌলবাদের স্বরূপ হল ধর্মভিত্তিক এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়াশীল চেতনা ও কট্টর দৃষ্টিভঙ্গী, যা একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট।

---

১৪. কথাটির শাব্দিক অর্থ মূল বিষয়কে আঁকড়ে ধরা, এখানে মৌলবাদ তথা মৌলবাদী বলতে একশ্রেনীর লোক বা বিশ্বাসকে বোঝানো হচ্ছে, যে বিশ্বাস অন্য কোন যুক্তিসিদ্ধ আচরণ বা চিন্তাধারাকে মানে না। এবং বিশ্বাস বিশেষত ধর্মীয় বিশ্বাস।

-Macmilan, *Anthropological Dictionary*

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবন ধারার পুরো সময়কালটিতে সামাজিক নৈরাজ্যবাদ, সৎ ও দক্ষ মানুষের প্রতি অবহেলা, কালো টাকার একচেটিয়া প্রাধান্য, পরনির্ভরশীলতা, শিল্পায়নের অভাব, শিক্ষাক্ষেত্রে সন্ত্রাস, তীব্র বেকারত্ব, সমাজের সকল স্তরে অসৎ দূর্নীতিবাজদের সমাবেশ ব্যাপক মানুষের মাঝে বিশেষত শিক্ষিত মানসে সৃষ্টি করেছে হতাশা অনীহা ও অনাগ্রহ। এই সামাজিক সংকটের সুযোগে দ্রুত প্রসারিত হয়েছে মৌলবাদ।

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ। মাঝে তেইশ বছর। এই তেইশ বছরে ঘনীভূত হয়েছিল রাজনৈতিক সংকট। পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর অভ্যন্তরে বাঙালিরাও আত্মপরিচয়ের সংঘাত থেকে সংকট এবং যার অনিবার্য পরিণতি বাংলাদেশ। সংকট প্রক্রিয়া মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম ।

সংকটের রাজনীতি নেতৃত্বের সৃষ্টি, জনগণের নয়। উপরন্তু রাজনৈতিক সংকট থেকে ক্ষমতা প্রয়াসী রাজনৈতিক নেতৃত্বের লাভ হলেও জনগণের কোন লাভ হয়নি। বরং সংকটের রাজনীতির প্রক্রিয়া হিসাবে হরতাল-ধর্মঘট ও ঘেরাও জনজীবনের ভোগান্তি বাড়িয়েছে, এমনকি বিপর্যস্তও করেছে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যে সব প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান, কোন সরকার/ দলই সেগুলি দূর করার চেষ্টা করেনি। সে প্রতিবন্ধকতাগুলো হল প্রধানতঃ আমলাতন্ত্র, দূর্নীতিকরণ ও দুর্বৃত্তায়নে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবহার, নির্বাচন প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক দলসমূহের সন্ত্রাস ও অস্বচ্ছ অর্থ ব্যবস্থাপনা, ধর্ম এবং ব্যবসায়ীদের প্রশ্রয়। এ কারণে দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নও পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশে সাবেক পাকিস্তানের মতোই একটি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পুনঃস্থাপিত হয়েছে। আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে রাজনীতিকদের ব্যর্থতা, বাংলাদেশের শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। আমলাতন্ত্রের সাধারণ বিভাগ দুটি- সামরিক ও বেসামরিক। কখনোও সামরিক কখনো বেসামরিক আমলাতন্ত্র মানুষের হয়রানির প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তান ভাঙার সিংহভাগ দায়িত্ব ছিল সামরিক বেসামরিক আমলাদের। তাদের উত্তরসূরীরা পরবর্তীকালে বাংলাদেশে শাসন কাজে বিঘ্ন ঘটিয়েছে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে চলেছে আমলা শাসন এবং দেশে প্রবর্তিত হয়েছিল অবাধ লুটপাটের শাসন যা দেশকে পৌঁছে দিয়েছে ধ্বংসের সীমায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ার আগেই এমন সব ঘটনা ঘটেছিল যে দেশের অস্তিত্বই হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল।

আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সবচেয়ে মর্মান্তিক দিকটি হচ্ছে দূর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার দুর্বৃত্তায়ন ও দূর্নীতিকরণ শুরু হয়েছিল পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন শুরু হবার পর। এসময় দুর্বৃত্তায়নের একটি নতুন ধারা যুক্ত হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র সংগঠনগুলিকে সন্ত্রাসী করে তোলা।

দুঃখজনক হলো বাংলাদেশে এই দূর্নীতিকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে ফেলা হয়েছে। অর্থাৎ যে দলই ক্ষমতায় গিয়েছে সে দলই লুট করেছে, পরবর্তী দল ক্ষমতায় গিয়েও লুট করেছে এবং নিজ দল ভারী করার জন্য পূর্ববর্তী দলের দূর্নীতির তদন্ত তেমন ভাবে করেনি। দূর্নীতি প্রত্যয়টি ব্যাপক অর্থে দেখলে দেখা যাবে ধারাবাহিকভাবে সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

সন্ত্রাস শুধু জাতির অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করেনা, নতুন সন্ত্রাসেরও জন্ম দেয়। রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও ইপ্সিত গণতন্ত্র পাশাপাশি লালিত ও বিকশিত হতে পারেনা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাসের জন্ম নিতে থাকে।

মাস্তানরা অস্ত্রের বলে, পেশী শক্তির বলে নারী অপহরণ নারী ধর্ষন, খুন-ডাকাতি, রাহাজানি, চাঁদাবাজি ইত্যাদি অসামাজিক সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যায় অবাধে। কিন্তু এরা ধরাছোঁয়ার বাইরে। পুলিশ এদেরকে গ্রেপ্তার করতে পারেনা। এদের বিচার হয়না। কোন এক অদৃশ্য শক্তি এদের নিয়ন্ত্রণ করে। মদদ জোগায়। সন্ত্রাসের আতঙ্কজনক বৃদ্ধি বেকার সমস্যার সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সন্ত্রাস কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয়, সমাজের এমন এলাকা কম আছে যেখানে সন্ত্রাস অনুপস্থিত।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে হরতালকে ব্যবহার করা হয়। পূর্বে আন্দোলনের কৌশল হিসাবে হরতালের ব্যবহার ছিল সীমিত। হরতাল তখনই ডাকা হত যখন রাজনৈতিক দলগুলো জানতো যে, যে

Dhaka University Institutional Repository

ইস্যুতে হরতাল ডাকা হচ্ছে তার পিছনে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পাওয়া যাবে। ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকে এক দিনের সাফল্যমন্ডিত হরতালকে একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সূচক হিসেবে ধরা হত। হরতালের সংখ্যা ছিল সীমিত কিন্তু সার্থক হরতালেরও রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল প্রচুর। কিন্তু পরে রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তি, তথ্য প্রমাণের দিকে জোর না দিয়ে শুধু গায়ের জোরে হরতাল করে প্রমাণ করতে চায় যে, জনসমর্থণ তাদের পক্ষে। উল্লেখ্য আমাদের স্বাধীকার আন্দোলনের সময় হরতাল ঘেরা ও অসহযোগ এসব কৌশল রাজনৈতিক দলগুলি ব্যবহার করে ছিল; কিন্তু এইসব কৌশল ব্যবহারের আগে তারা আমাদের স্বাধিকার আদায় করা প্রয়োজন কেন এ প্রশ্নের উত্তর তথ্য-প্রমাণ ইত্যাদি দিয়ে জনসম্মুখে তুলে ধরেছিল।

সামান্য কারণে কর্মবিরতি, হরতাল, মিছিল এবং ঐ সুযোগে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি, গাড়ী, বাস, ট্রাক, পোড়ানো, ভাঙানো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গড়ার কাজের চেয়ে ভাঙার, উন্নয়নের চেয়ে ধ্বংসের কাজে অধিক উৎসাহ ও প্রবণতা। ফলে শিল্পে বিনিয়োগ মন্থর হওয়ায় বেকার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা, আইন অমান্য করা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের সাথে মারামারি করা একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

হরতাল একটা স্বতঃপ্রবৃত্ত ব্যাপার। বাংলাদেশে হরতাল তার ঐচ্ছিক ও আত্মীক শক্তি হারিয়ে আইন শৃঙ্খলাহীনতায় পর্যবসিত হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে রাজনৈতিক হরতালে প্রতিদিন বাংলাদেশের ছয় কোটি ডলার ক্ষতি হচ্ছে।[১৫] প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে হরতাল তার মূল্য ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে।

আমাদের সকলের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে, দেশে সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু আমাদের রাজনীতিতে জনস্বার্থের পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থ এবং জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে দলীয় স্বার্থ বড়ো হয়ে উঠেছে যা সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রের পরিপন্থী। সরকার পরিচালনায় জবাবদিহিতা ও

১৫.প্রথম আলোর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের লেখা থেকে, ৪ নভেম্বর, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

স্বচ্ছতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। জনমত উপেক্ষা করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকার চেষ্টা চালানো হয়। আমাদের রাজনীতিতে সৎ, দক্ষ, ন্যায়পরায়ন ও দেশ প্রেমিক লোকের খুবই অভাব। তাই রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি বিরাট শুদ্ধি অভিযান ও বৈপ্লবিক সংস্কার সাধনের আশু প্রয়োজন।

এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাক, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক এটি সর্বশ্রেনীর জনগণের কাম্য। রাজনৈতিক স্থবিরতা, অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক অব্যবস্থা সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময় থেকে বর্তমান বাংলাদেশে যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজমান তার সমাধান সরকারী ও বিরোধী দলের সমঝোতার মাধ্যমে করতে হবে। তবে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে ঐ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী যেন কোন ফাঁক-ফোঁকরে বৃহৎ শক্তিতে পরিণত না হতে পারে। স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ যেন জিম্মি না হয়ে যায় সাম্প্রদায়িক অপশক্তির কাছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

রনবীর কার্টুনের বিষয়বস্তু

চিত্রকলা হচ্ছে সভ্যতার ইতিহাস শুরুর প্রথম সোপান এবং সবচাইতে প্রাচীন প্রমাণ বা দলিল। মানুষের আনন্দ-বেদনা, ভয়-ভীতি, প্রেম-ভালবাসা, আচার-আচারণ, আহার-আহরণ, বিস্ময়-বিভ্রান্তি, ক্রোধ ইত্যাদি চিত্রে ধৃত হয়ে আসছে মানবসভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে। আদিকালে গুহাচিত্র দিয়ে যার শুরু তা আজও অব্যাহত আছে শিল্পীদের চর্চায়। ভৌগোলিক সভ্যতা, পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে বিকাশের ক্রমধারার চিত্রে, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জৈবিক, মানবিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিষয়াদি। মানুষ নিজেকে নিজে চেনার চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করেছে অপরকেও চেনার। এইভাবে সামগ্রিকভাবে পরচর্চা, নিন্দা, ঠাট্টা ইত্যাদি অভ্যাস রপ্ত করেছে মানসিক বোধ-বুদ্ধি বিকাশের মাধ্যমে। এসবের একটি পরিশিলীত পর্যায় হলো সমালোচনা। শিল্পীরা চিত্রকে শুধু সৌন্দর্য চর্চা কিংবা বর্ণনার মধ্যে গন্ডীবদ্ধ না রেখে সমালোচনাধর্মীতাকেও প্রশ্রয় দিয়েছেন। এবং তা করতে গিয়ে চিত্রে ভাব প্রকাশের নানা ধরণ এবং দিককে আবিষ্কার করেছেন। এসবের একটি বিশেষ শাখা হলো ব্যঙ্গ চিত্র বা কার্টুন।

কার্টুন থেকে অনেক সময় কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে এমন অনেক কিছু জানা যেতে পারে যার গুরুত্ব লিখিত মাধ্যম থেকেও হয়তো বেশী। বাংলাদেশের মত ক্ষুদ্র ও দরিদ্র দেশেও শিল্পকলার ক্ষেত্রটি বোধ করি একমাত্র ক্ষেত্র যার জন্য বাংলাদেশ গর্ব অনুভব করতে পারে। ক্ষুদ্র বাংলাদেশের ততোধিক ক্ষুদ্র শিল্পকলার জগতটিকে শুধু দেশেই নয় বিদেশেও জনপ্রিয় করেছেন শিল্প সাধনা ও গবেষণায় নিয়োজিত শিল্পীবৃন্দ। বিদেশের শিল্পপ্রেমী মানুষদের কাছে বাংলাদেশের শিল্পকে তুলে ধরার মাধ্যে দিয়ে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন।

এহেন দেশ সেবার মাধ্যমে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করবার ক্ষেত্রে যারা আত্মনিয়োগ করেছেন শিল্পী রফিকুন নবী তাদের মধ্যে অন্যতম। যিনি 'রনবী' নামেই বহুল পরিচিত। তার শিল্প কর্মের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে কার্টুন।

Dhaka University Institutional Repository

কার্টুনের সাহায্যে এদেশের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

'শিল্পী' কথাটি খুবই আপেক্ষিক যে শৈল্পিক গুণাবলী রেখে ছবি আঁকে, গান গায়, কবিতা লেখে এবং কিছু নির্মাণ করে সেইই শিল্পী। তাদের ভিতরে এমন কিছু দক্ষতা থাকে যাতে সমাজের অন্য দশজন সাধারণ মানুষ তার দ্বারা পরোক্ষে কোন না কোন ভাবে উপকৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পবোধ বা কলা বোধের কারণে সব মানুষের মধ্যেই শিল্পী মন সঞ্চারিত থাকে। সেই মনটিকে আলোড়িত, আন্দোলিত করে শিল্পীর শিল্পকর্ম। শিল্পকর্মগুলির কি কি ধরণ তার একটু উল্লেখ করা যাক। আঁকার ক্ষেত্রে চিত্র, ড্রইং ইত্যাদি প্রধান। নির্মাণের ক্ষেত্রে ভাস্কর্য, স্থাপত্য ইত্যাদি ড্রয়িং এর একটি শাখা ব্যঙ্গ চিত্র।

কার্টুনিস্ট একটা শিল্পমাধ্যম চর্চা করে এবং সে মাধ্যম যে শুধু ড্রইং, তা নয়। কার্টুনিস্ট হতে গেলে অ ক কিছু অর্জন করতে হয়। রসবোধ, চিন্তার গভীরতা, ব্যঙ্গাত্মক ভাব ফুটিয়ে তোলা, পরোক্ষ ভাবে চিন্তা উপস্থাপন করা ইত্যাদি একজন কার্টুনিস্টকে অর্জন করতে হয়। এসব অর্জন করলেই একজন কার্টুনিস্ট 'শিল্পী'। অনেক কার্টুনিস্ট আছেন যারা বহুদিন ধরে কার্টুন এঁকে যান। কিন্তু সে কার্টুনে প্রভাবিত হওয়ার মতো কিছু থাকে না। তাকে শিল্পী বলা যাবে না। সেদিক দিয়ে অনেক চিত্রশিল্পীও কিন্তু কার্টুনিস্ট হয়ে উঠতে পারেন না এগুলো অর্জনে ব্যর্থতার জন্য। তাই কার্টুনিস্ট তখনই শিল্পী, যখন তার অর্জন পুরোপুরি একশো ভাগে পৌঁছে যায়। শিল্প সাধনার নিরন্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রনবী নিজের আসনটিকে সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন।

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা অন্তর্জ্বালাকে রনবী প্রকাশ করেছেন 'টোকাই' এর মাধ্যমে। তাঁর সৃষ্ট 'টোকাই' যেন দেশের শোষিত, বঞ্চিত, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি কিংবা প্রতীক। [তাঁর এই টোকাই এনসাইক্লোপেডিয়া অফ কার্টুনের '৯৮ সংস্করণে স্থান পেয়েছে] ষাট এবং সত্তরের দশকেও তিনি এমনি প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন বিভিন্ন কার্টুনের মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

দেশ স্বাধীন হলেও এসকল শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাদের ভাগ্যোন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসে প্রতিটি সরকার শোষণের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর করেছে। শাসকদের বিচিত্রমুখী শোষণের যাঁতাকলে দেশের সাধারণ মানুষ পিস্ট হতে হতে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গেছে। অথচ উন্নত বিশ্বের চিত্র ভিন্ন রকম। সে দেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা আছে। তাদের অনেকের গাড়ি-বাড়ি আছে। একজন সাধারণ বাবুর্চিও নিজের গাড়ি চালিয়ে কর্মক্ষেত্রে যায় এবং কাজ সেরে গাড়িতে করেই বাড়ি ফেরে, যা আমাদের দেশের খেটে খাওয়া মানুষের নিকট স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের দেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ আর উপরতলার শোষক শ্রেণীর মধ্যে যে আকাশ-পাতাল বৈষম্য তা রনবীর কার্টুনে ব্যঙ্গময় হয়ে উঠে।

মূলতঃ হাত মকশো করার জন্য রনবী কার্টুন আঁকা শুরু করলেও একজন সফল কার্টুনিস্ট হিসেবে কখনোই তাঁর কার্টুনের বিষয়বস্তু খাপছাড়া নয়। নির্দিষ্ট কিছু কাঠামোর উপর ভিত্তি তাঁর কার্টুনের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেন। আর সে হিসেবে দেখলে রনবীর কার্টুনকে আমরা বিশেষ কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। ছকের সাহায্যে এর উপর আলোকপাত করা হলোঃ

বিষয়

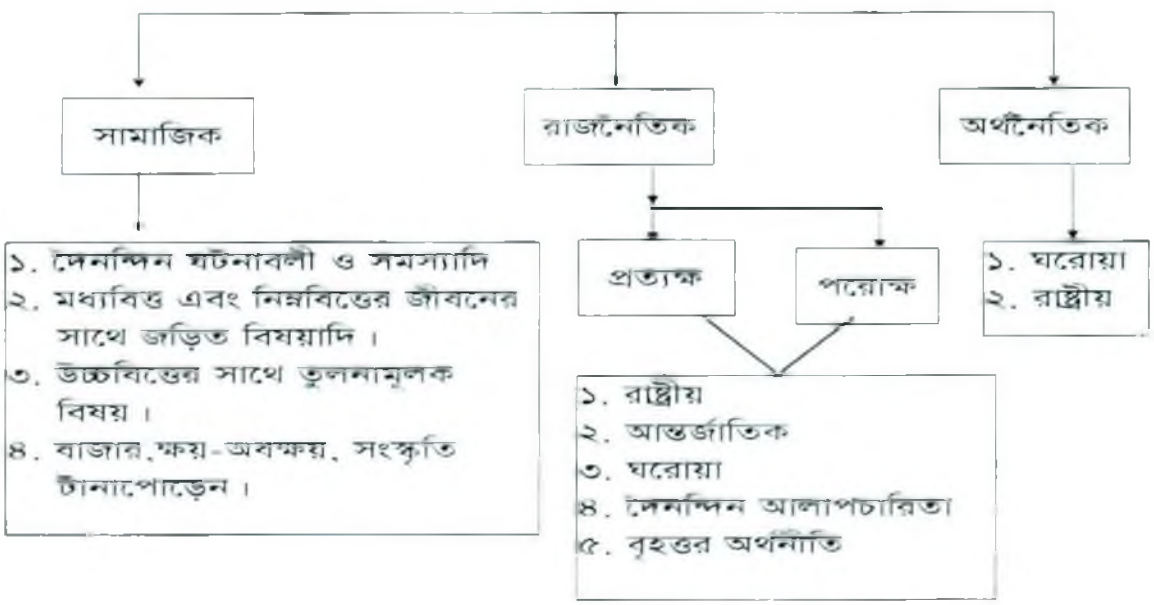

Dhaka University Institutional Repository

এবার উপরিউক্ত ছকটির বিস্তারিত রূপ বর্ণিত হলোঃ

সামাজিকঃ

অন্যান্য সকল বিষয়ের চেয়ে রনবী সামাজিক বিষয়ের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেন। আর সে কারণেই তাঁর কার্টুনে সামাজিক দিকটি তুলনামূলক ভাবে বেশী আলোকিত হয়ে উঠে। সামাজিক যে সকল ব্যাপারে রনবী কার্টুন এঁকেছেন সেগুলিকে আবার বিশেষ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমনঃ-

১. দৈনন্দিন ঘটনাবলী ও সমস্যাদি- মানুষের জীবন গড়ে উঠে তার দৈনন্দিন জীবনকে কেন্দ্র করে। দৈনন্দিন ঘটনাগুলো মানুষকে মহাবিশ্বে তার অবস্থান চিনিয়ে দেয়। মানুষের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখগুলো গড়ে উঠে তার সামাজিক প্রেক্ষাপটে। এ কারণে সামাজিক চিন্তা-চেতনা বোঝাতে কার্টুন অনেক ক্ষেত্রে মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে তার বিষয়বস্তু বানিয়ে থাকে। রনবীর কার্টুনগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। রনবীর প্রচুর কার্টুন থেকে দৈনন্দিন ঘটনাবলী ও সমস্যাদি নিয়ে অংকিত কয়েকটি কার্টুন আলোচিত হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'য় প্রকাশিত আব্দুস শাকুরের 'মধ্যবিত্তের কড়চা' নামক কলামে অংকিত আলোচ্য কার্টুনটি লেখাইন। কিন্তু ছবির মধ্য দিয়ে তিনি বাক্যের অভাব মিটিয়ে দিয়েছেন। ছুটির দিনগুলিতে প্রতিটি পরিবারের গৃহকর্তার সকালে বাজারে যাবার যে ঝঞ্ঝাট্ তা রনবী চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

গিন্নীর হাতের বাজারের ব্যাগ এবং কর্তার বিরস বদন দেখে এক লহমায় বুঝা যায় সপ্তাহান্তে ছুটির আমেজটুকুর উপর হস্তক্ষেপের চিরন্তন বিরক্তি।

দ্বিতীয় কার্টুনটি সত্তরের দশকে 'সন্ধানী' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এই কার্টুনে আমরা দেখতে পাই,

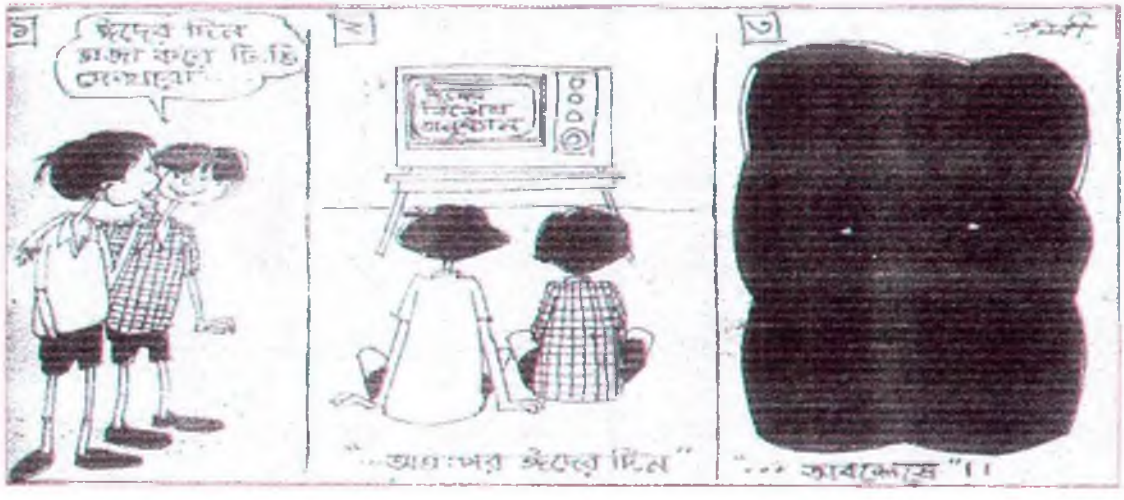

দুটি ছোট ছেলে তাদের অতি আকাঙ্খিত ঈদের টি.ভি অনুষ্ঠানগুলি আনন্দের সাথে উপভোগ করবে বলে আশা করছে। কিন্তু তাদের এই আশা দুরাশায় পরিণত হলো যখন অনুষ্ঠান শুরুর পূর্ব মুহূর্তে লোড শেডিং হলো। একটি প্রধান উৎসবের দিনই যদি বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনার এ হাল হয় তবে বৎসরের অন্যান্য দিনগুলিতে বিদ্যুতের অভাবে মানুষ কতটা দূর্বিষহ জীবনযাপন করে তা রনবী এই কার্টুনের মাধ্যমে পরিস্ফুটিত করেছেন।

বাংলাদেশের সকল সেক্টরে সকল ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য জিনিসটির নাম বিদ্যুৎ। অর্থনৈতিক, সামাজিক সকল ক্ষেত্রেই এটি চাই। এটি ছাড়া চলে না এক মুহূর্ত। উন্নয়নের সবচেয়ে বড় পূর্বশর্ত বিদ্যুৎ। উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে এই খাতটিকে দৃঢ়, উন্নত ও সংহত

Dhaka University Institutional Repository

করার মধ্য দিয়েই যেতে হয়। বহুকাল ধরে আমরা উন্নয়নের কথা বলছি, কিন্তু উন্নয়নের পথের গোড়ায় যে ক্ষেত্রটি সেই বিদ্যুতের উন্নয়নে আমরা সমর্থ হয়নি। দিনে রাতে হচ্ছে লোডশেডিং। বিদ্যুতের অভাবে অনেক কিছু ব্যাহত হচ্ছে। উৎপাদনের ক্ষতি হয়। বিদ্যুতের সংকটের কারণে দেশে বছরে ৫০০ কোটি টাকার শিল্প উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। উৎপাদন ব্যবস্থার দৈন্য ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে বিদ্যুৎ সেক্টরে বার্ষিক লোকসান দাঁড়িয়েছে ৫০০ কোটি টাকা।[১] বিপুল লোকসানের মুখে খাতটি পরিচালনায় সরকারকে প্রতিবছরের বাজেটে দেড় হাজার কোটি টাকার মতো বরাদ্দ করতে হচ্ছে।[২]

বিদ্যুত সেক্টরের এই হাল একদিনে হয়নি। সুদূরপ্রসারী চিন্তাচেতনার আলোকে এই খাতের প্রতি আগে থেকে যথাযথ মনোযোগ দেয়া হয়নি বলেই অবস্থা এরকম হয়েছে। বিদ্যুতের সংকট নিয়ে অনেক কথা বলা ও অনেক লেখালেখি হয়েছে। এ ব্যাপারে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ সহ বিভিন্ন সময় নেয়া হলেও লক্ষণীয় উন্নতি হয়নি।

দৈনন্দিন কড়চাকে ঘিরে রনবীর পরের কার্টুনটির বিষয় খুবই আলোচিত এবং সমালোচিতও বটে। বিষয়টি হচ্ছে এক বিরাট শক্তি। যে শক্তির কাছে হার মেনেছে আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি আমলের সরকার। আর এই মহাশক্তিটির নাম মশা। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত এই কার্টুনে এক লোক টোকাইকে প্রশ্ন করছে- "মশা থাইকা বাঁচনের কি উপায়?"

টোকাইয়ের বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর--"মইরা যাওন।"

১. সূত্রঃ- ৪ আগষ্ট, ২০০০, দৈনিক জনকণ্ঠ।
২. বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত কার্টুনটি থেকে আমরা বুঝতে পারি মশা কতটা ভয়াবহ ভাবে আমাদের জীবনের একটি দৈনন্দিন সমস্যায় পরিণত হয়েছে। আর যেহেতু সাধারণ মানুষ এই সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত। তাই তারা সরকারকে এ কাজের জন্য আশাও করে না। আর এ কারণেই টোকাইয়ের মুখ থেকে খুব ব্যঙ্গাত্মক এবং একই সাথে করুণ কথাটি আমরা শুনতে পাই।

মশার দৌরাত্ম নিয়ে কথাবার্তা কম হয়নি। আসলে মশা নিয়ে শাসককূল জনগণের সাথে নিছক মশকরাই করেন কারণ মশার মত ক্ষুদ্র প্রাণীকে নির্বংশ করা যাবে না। একই ঔষধ বার বার প্রয়োগ করলে তার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়- সেটা জানার পরও নতুন কোন পন্থা চিন্তা করা হয়না। মশা ক্ষুদ্র প্রাণী। কিন্তু তার এ্যাকশন ক্ষুদ্র নয়। গোদ(ফাইলেরিয়া), ম্যালেরিয়া সহ নানা প্রকার জটিল রোগ মশার মাধ্যমে ছড়ায়। কাজেই মশার কামড়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে সরকার প্রকারান্তরে নগরবাসীর জীবনকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন।

২. মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের সাথে জড়িত বিষয়াদি- রনবীর কার্টুনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদেশের নিপীড়িত মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের জীবন নিয়ে অঙ্কিত। এসব কার্টুনের মধ্যে দু'একটি সংশ্লিষ্ট হলোঃ

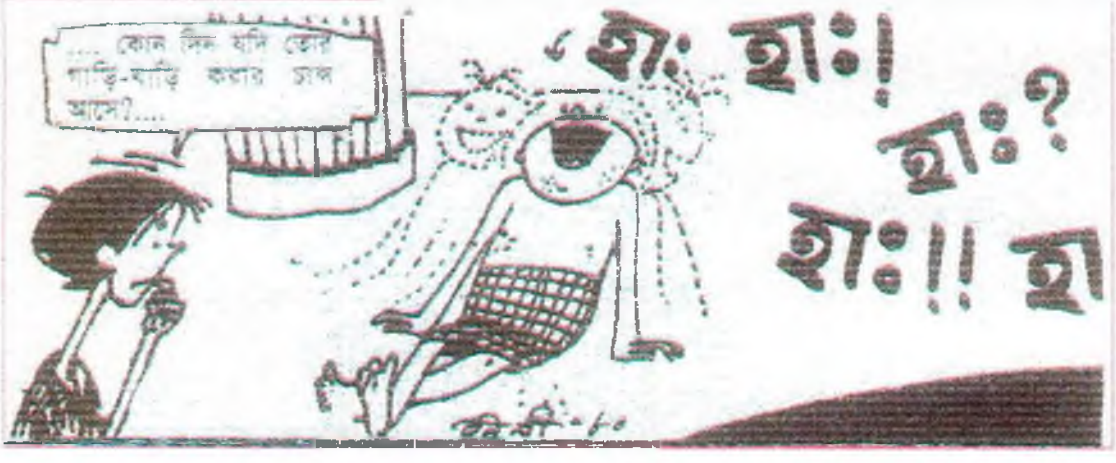

এই কার্টুনটি ১৯৮০ সালে 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। এই কার্টুনে রয়েছে রনবীর বিখ্যাত চরিত্র 'টোকাই'। এখানে টোকাইয়ের সমবয়সী একটি ছেলে টোকাইকে প্রশ্ন করছে যে- "তোর যদি কোনদিন গাড়ি-বাড়ি করার চান্স আসে?"

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যুত্তোরে টোকাই হাঃ হাঃ ! হাঃ? হাঃ!! হা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। কিন্তু এই অট্টহাসিটি প্রকাশ করে একজন নিম্নবিত্তের পক্ষে গাড়ি-বাড়ি কতখানি অকল্পনীয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে একজন গরীব মানুষের পক্ষে তার অবস্থায় উন্নতি প্রায় অসম্ভব। কেননা সম্পদের অসম বন্টনের কারণে ধনী ক্রমাগত ধনী হচেছ এবং গরীব আরো গরীব হচেছ। একজন নিম্নবিত্তের প্রতিনিধি রূপে টোকাই-এর মধ্য দিয়ে রনবী এদেশের দরিদ্র শ্রেনীর অবস্থা বুঝিয়েছেন।

নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকদের জীবন ক্রমেই দূর্বিষহ হয়ে উঠছে। উচচবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের জীবনের পাশাপাশি নিম্নবিত্ত জনগণের বিবর্ণ জীবন যে ক্রমশ আরো হতাশাকীর্ণ হয়ে পড়ছে তা বলা বাহুল্য। অর্থনৈতিক ভাবে এই অসহায় নিম্নবিত্ত শ্রেনীর মানুষ দিন দিন আরো পঙ্গু হয়ে পড়ছে। নিম্নমধ্যবিত্ত বর্তমান অর্থনৈতিক, আর্থিক মন্দা, জীবিকার অভাব ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী সংগ্রহের অপারগতার মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে আরো বিপন্ন দশায় উপনীত হয়। আর্থিক সংকটের প্রেক্ষাপটে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেনীর অবস্থান ও সামাজিক অবস্থার সার্বিক মূল্যায়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের জীবনের সাথে জড়িত বিষয়াদির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা রনবীর দ্বিতীয় কার্টুনটির উৎস ও চরিত্র একই। এখানে রনবী মধ্যবিত্ত জীবনের একটি প্রকট সমস্যা, বেকার সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন। কার্টুনটিতে এক যুবক টোকাইকে জিজ্ঞাসা করছে তুই বলে চাকরি লইছস?

টোকাইয়ের তাৎক্ষনিক জবাব-

চাকরি কেউ লইতে পারে নাকি?! চাকরি দেয়....

অর্থাৎ এই সমাজের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা শেষ করে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকুরীর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু চাকুরী পায় না। কেননা আমাদের দেশে কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। আর যেটুকু আছে তাতেও সুযোগ পায় সেসব ছেলে-মেয়ে যাদের আছে খুঁটির জোর এবং ঘুষ দেবার মত অবস্থা। ফলে দেশে বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। বেকারদের কাছে চাকরি না পাওয়ার যন্ত্রণা তো আছে, তার ওপর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এর শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়। অথচ একজন বেকার যখন পরিবার-পরিজনদের কাছে অপাঙক্তেয় হয়ে যায়

Dhaka University Institutional Repository

তখন তার কাছে ব্যাংক ড্রাফটের টাকা শোষণের এক চমৎকার ব্যবস্থা। উন্নত রাষ্ট্রে বেকার ভাতা দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। সেই তুলনায় আমাদের দেশে ব্যাংক ড্রাফটের টাকা মওকুফ করা যেতে পারে। এসব কারণে বেকারত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে বেকাররা নৈতিক অবক্ষয়ের পথে পা বাড়ায়।

৩. উচচবিত্তের সাথে তুলনামূলক বিষয়- বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাগুলো দেখাতে গিয়ে রনবীর কার্টুনে প্রায়ই মূখ্য হয়ে উঠে উচচবিত্ত সমাজের সুখ ও আভিজাত্যের সাথে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের পার্থক্য। এসব পার্থক্য থেকেই বের হয়ে আসে সমাজের খেটে খাওয়া মানুষগুলোর বঞ্চনার কথা। যথারীতি এখানেও উক্ত বিষয়ের চিত্র বুঝাতে দুটো কার্টুন সংযুক্ত হলোঃ-

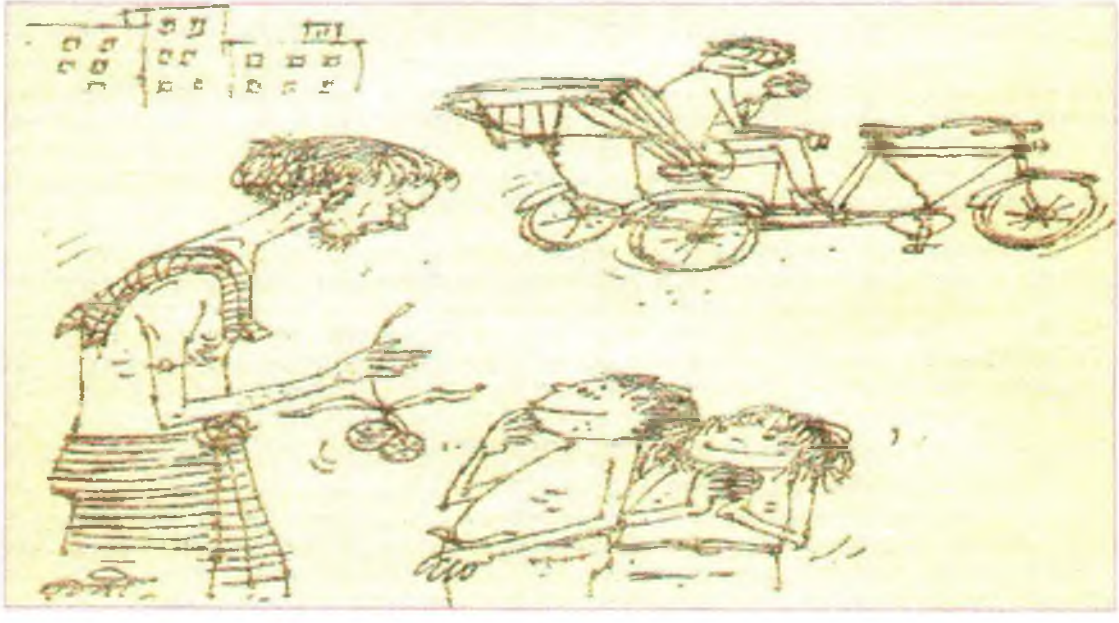

প্রথমটি আব্দুস শাকুরের 'মধ্যবিত্তের কড়চা' থেকে নেয়া হয়েছে। এই কার্টুনটিতে চার জন ব্যক্তিবিশেষকে দেখা যাচেছ। এদের মধ্যে একজন রিকশা আরোহী স্বচছল ব্যক্তি, একজন রিকশা চালক এবং অপর দুজন তার ছেলে মেয়ে। এখানে রিকশারোহী ভদ্রলোক যাচিছলেন তার সন্তানের জন্য কেজি দরে লিচু কিনতে। কিন্তু পথিমধ্যে তার রিকশা চালক একস্থানে রিকশা রেখে রাস্তার পাশে লিচুর দোকান থেকে মাত্র দুটি লিচু কিনে সেখানে থাকা তার ছেলে-মেয়ে দুটিকে লিচু দিল এবং ঐ লিচু পেয়ে সন্তানদ্বয় পরম

Dhaka University Institutional Repository

আহ্লাদিত হলো। নিম্নবিত্তের এই ছোট আবদার ও তার চাইতে ছোট প্রাপ্তি যা কিনা স্বচ্ছল ব্যক্তির বিস্ময়ের কারণ হয়েছে তা এই কার্টুনে সুন্দর ভাবে বিবৃত হয়েছে। এখানে তিনি অত্যন্ত সফলভাবে প্রকাশ করেছেন সম্পদশালী সম্পদের প্রাচুর্য যেমন গরীবের কাছে অসম্ভব তেমনিভাবে গরীবের অপ্রাচুর্যের প্রবলতা ধনীর কাছে অবাস্তবতার সামিল।

দ্বিতীয় কার্টুনটি নেওয়া হয়েছে 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা' থেকে। এটি ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

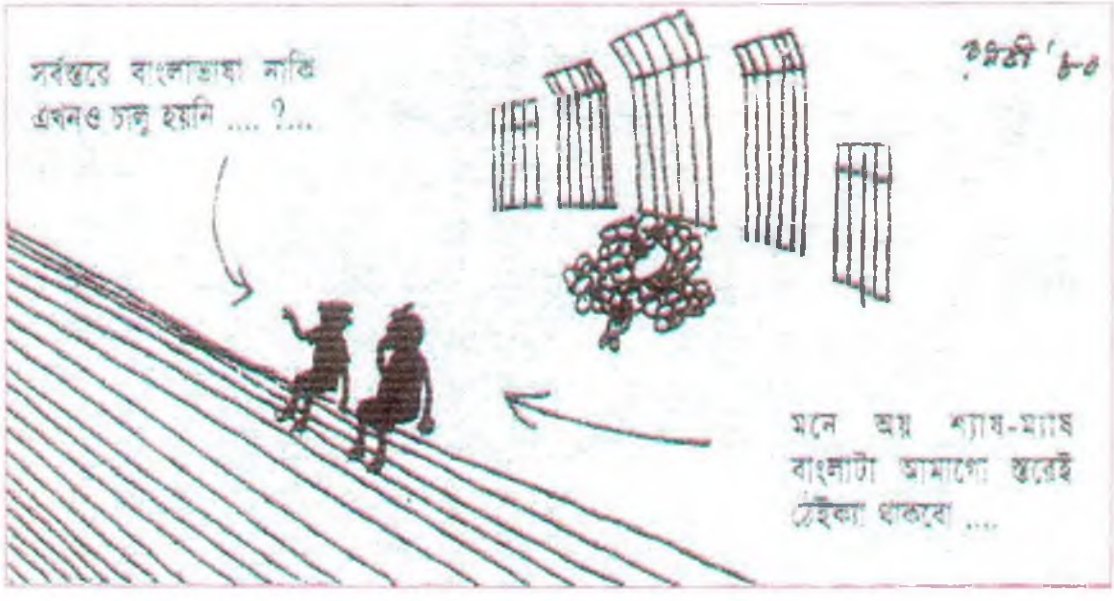

উক্ত কার্টুনে একজন মধ্যবিত্ত ঘরের বালক টোকাইকে প্রশ্ন করছে, "সর্বস্তরে বাংলা ভাষা নাকি এখনও চালু হয়নি?" টোকাই উত্তরে বলছে, মনে অয় শ্যাষ-ম্যাষ বাংলাটা আমাগো স্তরেই ঠেইক্যা থাকবো। উচ্চবিত্তের সাথে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেনীর পার্থক্য যে সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছে সেটিই সত্তর দশকের শেষের এই কার্টুনটিতে পরিষ্কার ভাবে চিহ্নিত হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমরা স্বাধীন দেশের অধিবাসী কিন্তু এখনও নতুন বিশ্বব্যবস্থার আলোকে আমাদের রাষ্ট্রটি সম্পূর্ণ স্বকীয়তা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলীকে অর্জন করতে পারেনি। এখনও আমাদের রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে স্থিত একটি ব্যবস্থাপক মন্ডলী -যার প্রচলিত নাম আমলাতন্ত্র বাংলাভাষাকে আদরের সঙ্গে গ্রহণ করতে অনাগ্রহী। ইংরেজী ভাষায় বাংলা প্রচলণের নির্দেশ জারির ঘটনাটি তারই উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী ভাষার বিপক্ষে সুযোগ নেই। কারণ এক বিশ্বের তত্ত্ব আজ বাস্তব প্রয়োজনেই ধ্বনিত হচেছ। একুশ শতকে পৃথিবী অনেক বদলে যাবে। এই বদলকৃত পরিবেশে নিজেদের বাঙ্গালী পরিচয়কে উত্তীর্ণ রাখার স্বার্থেই দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজীর প্রতি জোর দিতে হবে। তবে বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়ে নয়। বাংলা ভাষা বেশী বেশী চর্চার মাধ্যমে আমাদেরকে জাতি গঠনের নবতর প্রেরণা গ্রহণ করতে হবে।

৪. বাজার, ক্ষয়-অবক্ষয়, সংস্কৃতি টানাপোড়েন- সমাজের মধ্যকার বাজার, সংস্কৃতির তথা মানুষের নৈতিক চরিত্রের ক্ষয়-অবক্ষয় প্রকাশ করে ঐ সমাজের চালচিত্র। তাই কার্টুনের মাঝে ঘুরে ফিরে বারবার আসে বাজার, সংস্কৃতি, ক্ষয়-অবক্ষয় প্রভৃতি। উক্ত বিষয়ের আলোচিত কার্টুনটি 'দৈনিক বাংলা'য় প্রকাশিত হয়েছিল।

এখানে দেখা যাচেছ যে, দু'জন ব্যক্তি অফিস কক্ষের পাশে আলাপ করছে, ঘুষ ছাড়া কোন কাজ কেউ কোনদিন আদায় করতে পেরেছে কিনা? তখন একজন উত্তর দিচেছ- "ধুৎ ! অত 'রিস্কে'কে যায়?" অবক্ষয়ের মাত্রা কোন স্তরে পৌঁছালে মানুষ কোন কাজ আদায়ে ঘুষ ছাড়া কিছু চিন্তা করতে পারে না তা এই কার্টুনে বিবৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘুষের 'মহিমা'র কথা কারো অজানা নয়। 'ঘুষ' অনেক অচল জিনিসকে সচল করে, আবার সচলকে করে নিশ্চল। সরকারী অফিস আদালতে 'ঘুষ'কে এখন আর ঘুষ মনে করে না কেউ। কারো কাছে ওটা 'উপরি', কারো ভাষায় 'বকশিস' কারো বক্তব্য চাকুরী করি বেতন পাই- কাজ করি পয়সা পাই, এতে দোষের কি? বরং কে কত ঘুষ খায় বা খেতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলছে সর্বত্র। সরকারী ঘুষের উপদ্রব এখন আর গোপন কোনো ব্যাপার নয়। এক রকম প্রকাশ্যেই চলে দেন-দরবার, লেনদেন । দাতা নিতান্তই নিরুপায় হয়ে ঘুষ নামক মহার্ঘ্য বস্তুটি তুলে দিতে বাধ্য হন গ্রহীতার হাতে। নইলে কাজ উদ্ধার হবে না, ক্ষতি হয়ে যেতে পারে অতি মাত্রায়। বৈধ অবৈধ উভয় কাজে ঘুষ অপরিহার্য। বর্তমানে দূর্নীতির শিকার অনেক গভীরে প্রবেশ করে বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। এই বিষ বৃক্ষের ফল গোটা জাতির জীবনকে করে তুলেছে বিষময়। রাষ্ট্র এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে হরেক রকম দূর্নীতি চলে; ঘুষ তার মধ্যে অন্যতম একটি । ঘুষ নিয়ে লেখালেখি কথাবার্তা হয়েছে বিস্তর, কিন্তু পরিস্থিতির হেরফের হয়নি। বরং দিন দিন ঘুষ- দূর্নীতির প্রকোপ বেড়েই চলেছে। ঘুষ- দূর্নীতি বিরোধী আইন আছে দেশে। কিন্তু কার্যকারিতা নেই। কারণ ভূত বসে আছে ভূত তাড়ানো সর্ষেতেই।

দ্বিতীয় কার্টুন সপ্তাহান্ত কার্টুন থেকে নেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে বাজার করে আসা এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বলছেন, তার ছোট্ট বাজারের থলিটি দেখিয়ে "দামের জন্য বাজার থেকে কিছু কেনারই উপায় নেই বলে থলেটিকে মিনি করে ফেলেছি"। ব্যাগ ভর্তি বাজার এবং সেই সাথে পকেটে সংগতি রাখতে গেলে যে কি অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে তার বর্ণনা এখানে চমৎকার ভাবে দেওয়া আছে। বাজার মূল্যের উর্ধ্বগতি মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে যে সীমিত করে ফেলেছে তা নিয়ে রসিকতা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মানুষের প্রয়োজনীয়তার কোন শেষ নেই। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্য না হলে একদিনও চলে না। বাংলাদেশে এক শ্রেনীর ব্যবসায়ী, আড়তদার, ফরিয়া, মহাজন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে। এসব শ্রেনী নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে পণ্য দ্রব্যের দাম বাড়ায়। এসব জিনিসপত্রের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় সীমাবদ্ধ আয়ের লোকদের ভোগান্তির শেষ থাকে না। তারা আয়ের সাথে ব্যয়ের সামঞ্জস্য করে উঠতে পারে না। ফলে পারিবারিক জীবনে শুর হয় অশান্তি ও কোন্দল। এমনকি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ঠিক মত ক্রয় করতে না পাড়ায় অনেকে দূর্নীতির দিকে ঝুকে পড়ে। বিশেষ করে রমযান মাসকে সামনে রেখে ব্যবসায়ীদের দাম বাড়ানোর মনোভাব প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায় দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য পণ্য দ্রব্যের মূল্য যাতে স্থিতিশীল থাকে সেদিকে সরকারের কঠোর দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। সেই সাথে আমাদের ব্যবসায়ী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন যাতে তারা নিজেদের স্বার্থে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যের দাম না বাড়ান। মূলতঃ যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা না আসবে ততক্ষন পর্যন্ত সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসবে না।

এছাড়া ১৯৭০ সালের ১৮ই জুলাই তৎকালীন ইংরেজী পত্রিকা 'ফোরাম'-এ রনবীর আঁকা প্রচ্ছদে আমরা দেখতে পাই যে, ছাত্ররা অস্ত্র হাতে অবাধে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করছে এবং শিক্ষক প্রাণের ভয়ে ভীত হয়ে বাঁধা দেবার বদলে সাক্ষী গোপাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ছাত্র সমাজের এই কলংকজনক কাজটি সমাজের অবক্ষয়েরই একটি অংশ বিশেষ। স্কুল কলেজ হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষাস্তরে নকল আজ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়ে ক্যান্সারের মত সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ফেলার উপক্রম করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

এক কথায় সাধারণ ভাবে বলা চলে মূল্যবোধের অবক্ষয়ই এ প্রবণতার কারণ। এর সাথে অর্থনৈতিক অবস্থা যুক্ত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রটাও এর সাথে বিবেচ্য। যদিও এগুলি সামাজিক অবক্ষয়েরই অর্ন্তভূক্ত। বিদ্যমান অসাধুতা, দূর্নীতি আমাদের জীবনের সর্বস্তরে গ্রাস করে ফেলেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়া স্বাভাবিক।

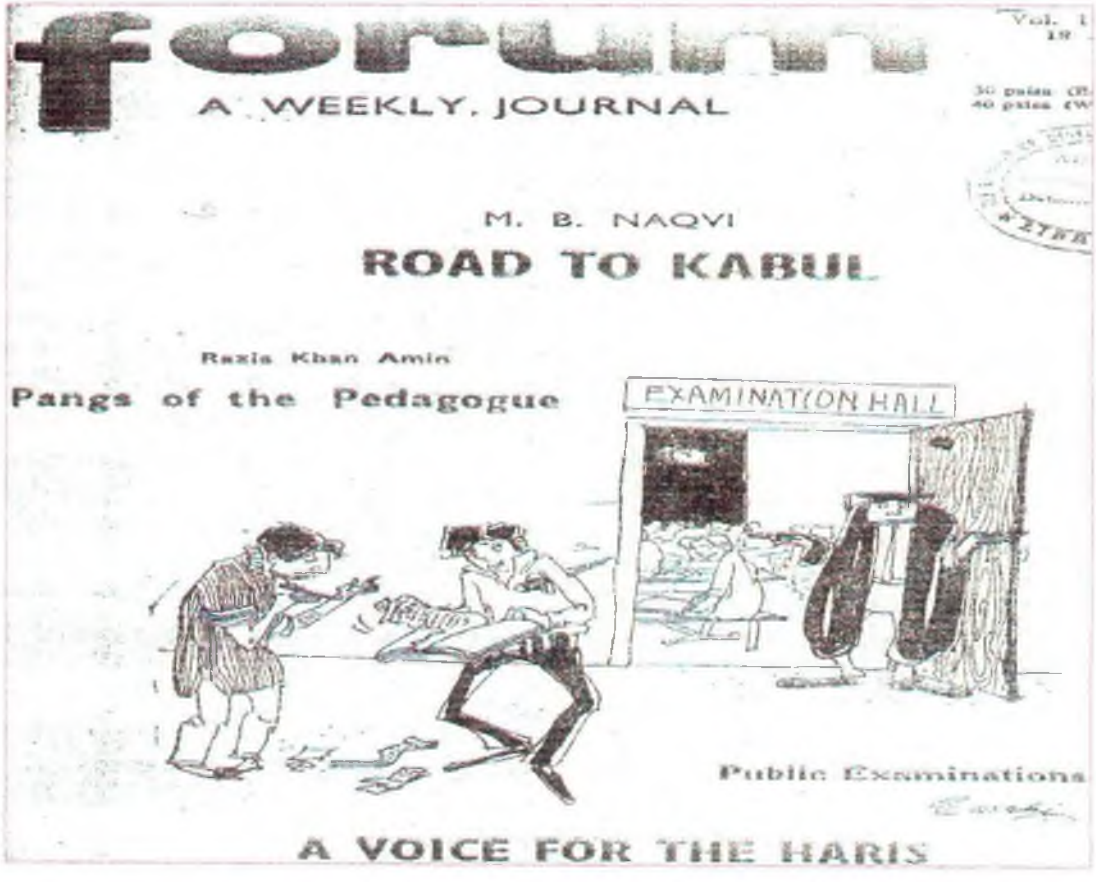

শিক্ষাক্ষেত্র সমাজ ও দেশেরই একটি প্রতিষ্ঠান। এ মূল্যবান প্রতিষ্ঠান কিভাবে সমাজের রাহুমুক্ত থাকবে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় ভিত্তিক শিক্ষা নিয়োগ হচ্ছে, যোগ্যতা দলের সমর্থক কিনা। ফলে প্রকৃত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের পরিবর্তে দলের ক্যাডার বা ডিগ্রী সর্বস্ব শিক্ষক নিয়োগ প্রাপ্ত হচ্ছে। আবার তারা যখন শিক্ষা দান করছেন তখন নিজের অবমূল্যবোধ সৃষ্টি করছেন অন্যদের মাঝে। চাকুরীর ক্ষেত্রে সততার সাথে নিয়োগ হয়না। কোন ক্ষেত্রে চাঁদা বা উৎকোচ প্রদান করে চাকুরী পাওয়া যায়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া থেকে দুরে সরে গিয়ে নকল করে পাশ করাটাকে মূল উদ্দেশ্য হিসাবে নেয়। কারণ চাকুরী হবার অন্যতম শর্ত সার্টিফিকেট ও

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ । যেখানে শিক্ষার মান থাকে না বললেই চলে এহেনবস্থায় নকল তো হবেই। নকল কোন একক ব্যাপার নয় এবং হঠাৎ করে একদিনে নকল বেড়ে যায়নি এটি ধীরে ধীরে বেড়ে যাওয়া দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারের মত সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। এখনও যদি আমরা এর প্রতিকারের দিকে সচেষ্ট না হই তাহলে এ জাতি ধ্বংসের দিকে এমনভাবে পতিত হবে যেখান থেকে আমাদের উদ্ধার পাওয়ার কোন পথ থাকবে না।

রাজনৈতিকঃ

একজন আদর্শ কার্টুনিস্ট-এর তাঁর কার্টুনকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য দেশের ও বিদেশের রাজনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে সজাগ থাকতে হয়। আর সে কারণেই আমরা দেখতে পাই রনবী তার কার্টুনগুলোতে অন্য বিষয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন। তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের দেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থাকে এবং সেই সাথে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে কখনো ব্যঙ্গ আবার কখনো প্রতীকের সাহায্যে তুলে ধরে জনগণকে এ বিষয়ে অবহিত করেন।

বিশ্লেষণের সুবিধার্থে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রনবীর কার্টুনগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেয়া যেতে পারে। যেমন-

১. রাষ্ট্রীয়- কোন দেশের নাগরিক রাজনীতির কথা চিন্তা করতে গেলে প্রথমেই ভাবে তার রাষ্ট্রের রাজনীতির কথা। বাংলাদেশের নাগরিকগণও এর ব্যতিক্রম নয়। দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলে রাষ্ট্রের পরিস্থিতি কিরূপ তা বোঝা যায় না। রনবীর রাজনৈতিক কার্টুনগুলি এ কারণেই সর্বদা দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বারবার সচেতন করে তোলে আমাদের। একজন সুনাগরিক হিসেবে রনবী সচেতন বিধায় তাঁর কলম রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সর্বদা সচল।

এ ব্যাপার বুঝতে আমরা কিছু কার্টুনের আশ্রয় নিতে পারিঃ--

রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারকরা বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে যে কেবল পরিকল্পনার মাঝেই আটকে থাকেন কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শুধু অসফলতাতেই পর্যবসিত হন তা ১৯৭০ সালের ২৯শে আগষ্ট ইংরেজী পত্রিকা 'ফোরামের'-এ রনবী অংকিত প্রচ্ছদে আমরা দেখতে পাই- -

Dhaka University Institutional Repository

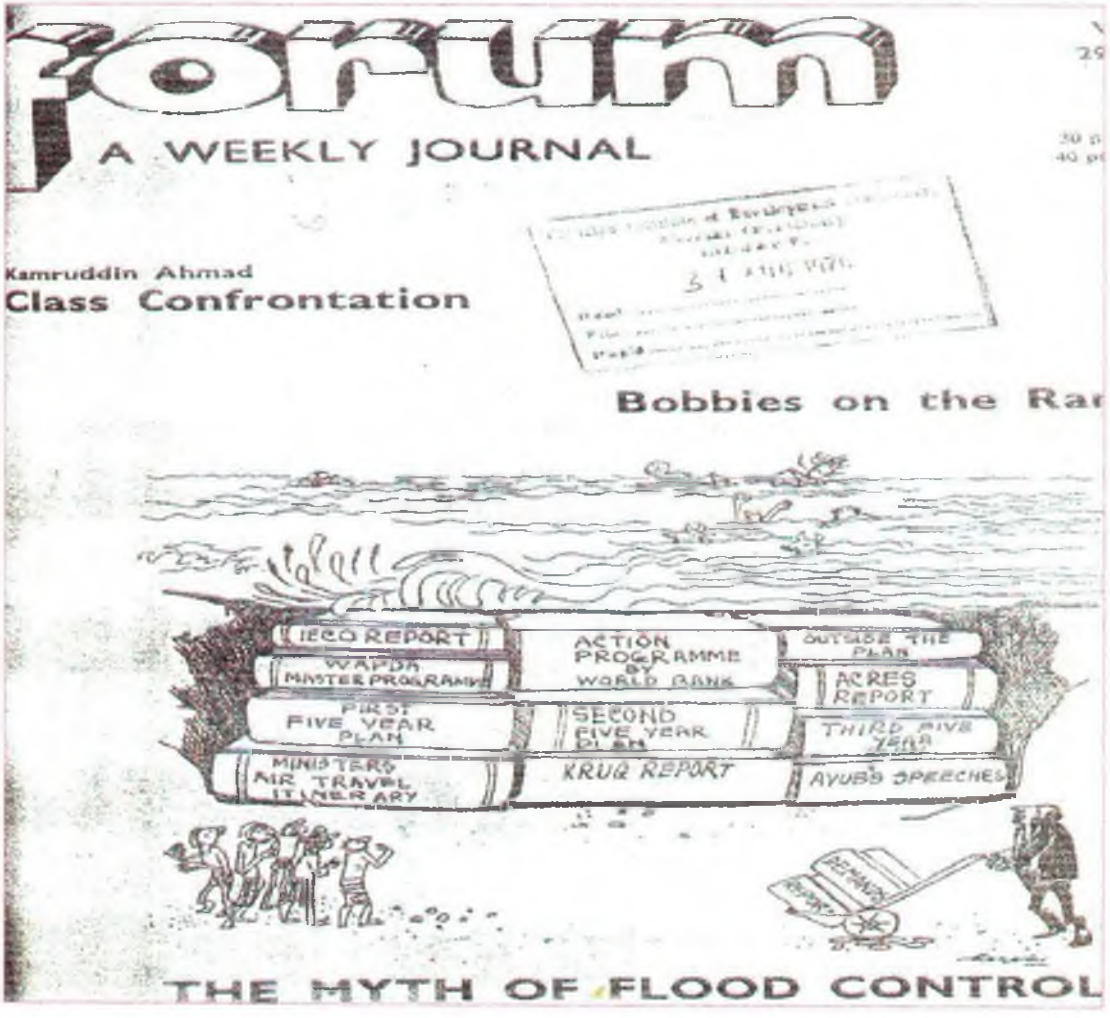

বন্যা বাংলাদেশের একটি চিরন্তন সমস্যা। আজ পর্যন্ত এ সমস্যার স্থায়ী কোন সমাধান কোন সরকারই করতে পারেননি । বন্যাকে কেন্দ্র করে রনবীর এই কার্টুনে দেখা যাচেছ, বেশ কিছু লোক, বাড়ি ঘর, গবাদি পশু বন্যার পানিতে ডুবে যাচেছ । আর শুধু বিভিন্ন পরিকল্পনার অবাস্তব চিন্তা থেকে বাঁধ বানানোর চেষ্টা করা হচেছ। অর্থাৎ কাজের কাজ কিছুই হচেছ না। সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতা- পূর্ব এবং উত্তর কালের মধ্যে কোন পরিবর্তন যে হয়নি তা ষাট-এর দশকে পাকিস্তান আমলে এ কার্টুনে বোঝা যায়। বর্তমানে দূর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের জন্য যেমন রয়েছে কেবল বাস্তবায়নহীন পরিকল্পনা তেমনি সে আমলেও একই পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল তা এ কার্টুনের মাধ্যমে বোঝা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০ সালের ১১ জুলাই 'ফোরাম' পত্রিকার আরেকটি প্রচ্ছদের কার্টুন থেকে আমরা দেখতে পাই,

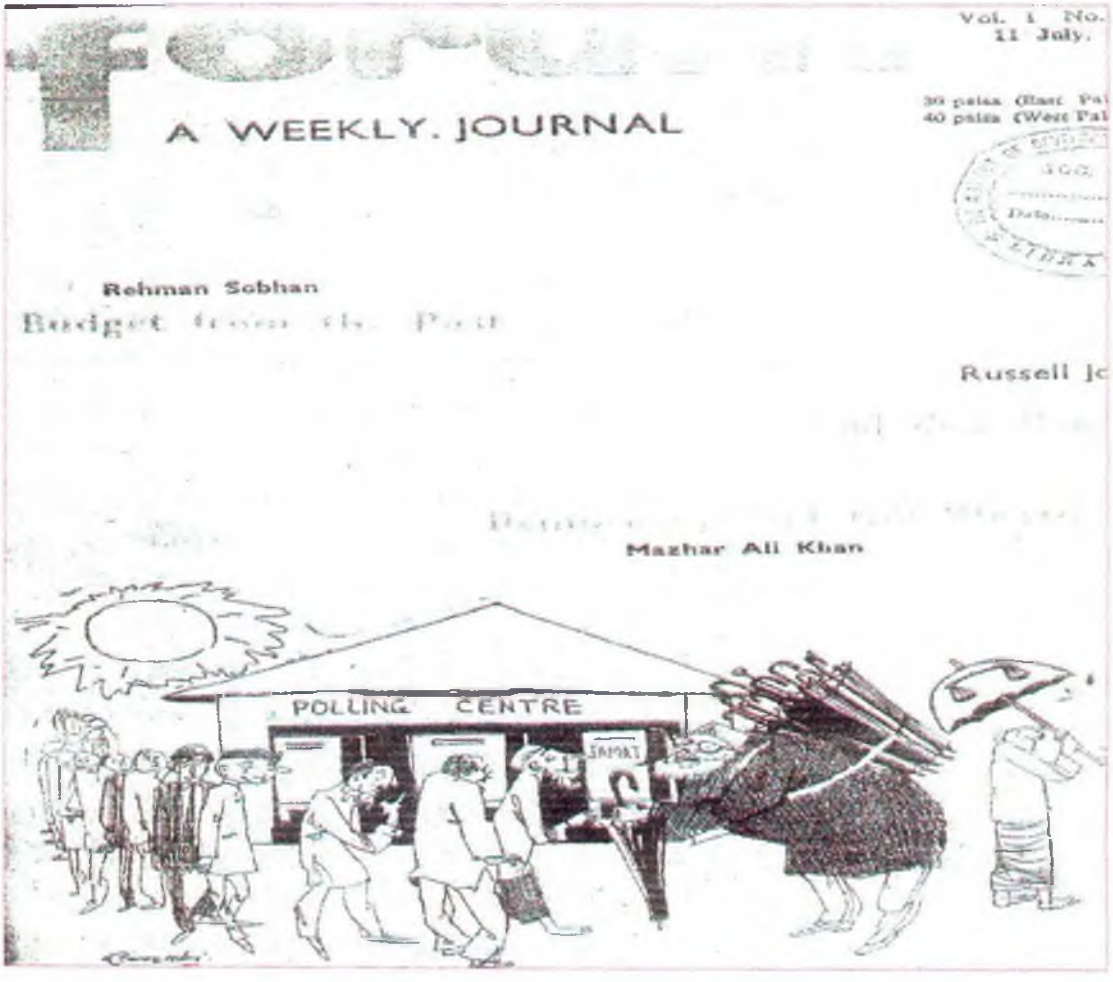

সেই সময়কার একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল, প্রখর রোদ্রে ভোট দিতে আসা একদল ভোটারকে নিজেদের দলের প্রতীক অংকিত ছাতা বিতরণ করছে এবং ভোটারগণও রৌদ্র হতে রক্ষা পেতে পরম নিশ্চিন্তে উক্ত দলীয় ছাপ মারা ছাতা গ্রহণ করছে। এই কার্টুনটিতে রনবী অসাধারণভাবে বুঝিয়েছেন এ দেশীয় ভোট প্রার্থী দল গুলোর চালচিত্র।

প্রত্যেকবার নির্বাচনের সময় ক্ষমতাগামী দলগুলো নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে দেশের প্রতিকূলতাকে পুঁজি করে সে অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং কিছু লোক দেখানো কাজ করে সহজ-সরল জনসাধারণের ভোট আদায় করে

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন। এই কার্টুনটিতে রনবী প্রতীকি হিসেবে প্রখর রৌদ্রকে স্থায়ী সমস্যা এবং ভোটের সময় প্রদত্ত ছাতাকে অস্থায়ী সমাধান হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। ঠিক ভোটের আগে রাজনৈতিক দলগুলো ভোটের প্রত্যাশায় ভোটারকে যে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি (লোভ) দেন তা নির্বাচনের পরে বেমালুম ভুলে যান তাই কার্টুনটিতে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

২. **আন্তর্জাতিক**- রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে শুধুমাত্র ঘরোয়া পরিমন্ডলেই নয় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও বিচরণ করতে হয়। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে রাজনীতির কোন ধারা চলছে তা থেকে আমরা আমাদের দেশীয় রাজনীতির সাথে বহির্বিশ্বের তুলণামুলক আলোচনা করতে পারি। তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতি কখনোই কোন সচেতন মানুষের ক্ষেত্রে একটি গৌণ বিষয় নয়। রনবীর কার্টুনে বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রাজনীতি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে তাঁর কার্টুন আঁকার প্রথম থেকেই।

এ বিষয়ের উপর কার্টুন সংযুক্ত হলোঃ-

১৯৭০ সালে 'ফোরাম' পত্রিকার প্রচ্ছদে প্রকাশিত হয় রনবীর একটি আন্তর্জাতিক রাজনীতিমুলক কার্টুন। কার্টুনটিতে দেখা যায়,

বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্রের মাঝে লেখা আছে 'VIETNAM PEACE PLAN,' 'MIDDLE EAST PEACE PLAN' প্রভৃতি শান্তির পরিকল্পনা। এগুলো সাজানো আছে একটি অস্ত্রের দোকানে। দোকানটির নাম দেওয়া আছে "NIXON'S SECOND HAND GOODS STORE" দোকানটির এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং অপর পাশে তৃতীয় বিশ্বের একজন দরিদ্র। রনবীর এই কার্টুনটির উদ্দেশ্য হলো- সর্বদা ইউরোপিয়ান তথা পাশ্চাত্য দেশগুলি ভালো মানুষি দেখানোর সাথে সাথে নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্য করে স্বার্থ সিদ্ধি করার বিষয়টি। ঔপনিবেশিক উত্তর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে কিভাবে তারা এখনও নিজেদের অশুভ তৎপরতা চালাচ্ছে তার অন্যতম একটি প্রতিচ্ছবি এই কার্টুনটি। বলা বাহুল্য বর্তমান সময়েও এ কার্টুনটির একই রকম আবেদন রয়ে গিয়েছে। উদাহরনস্বরুপ বলা যায় আরব শান্তির জন্য পাশ্চাত্যের একই সাথে মায়াকান্না আর অস্ত্র বিক্রির বিষয়টির কথা।

Dhaka University Institutional Repository

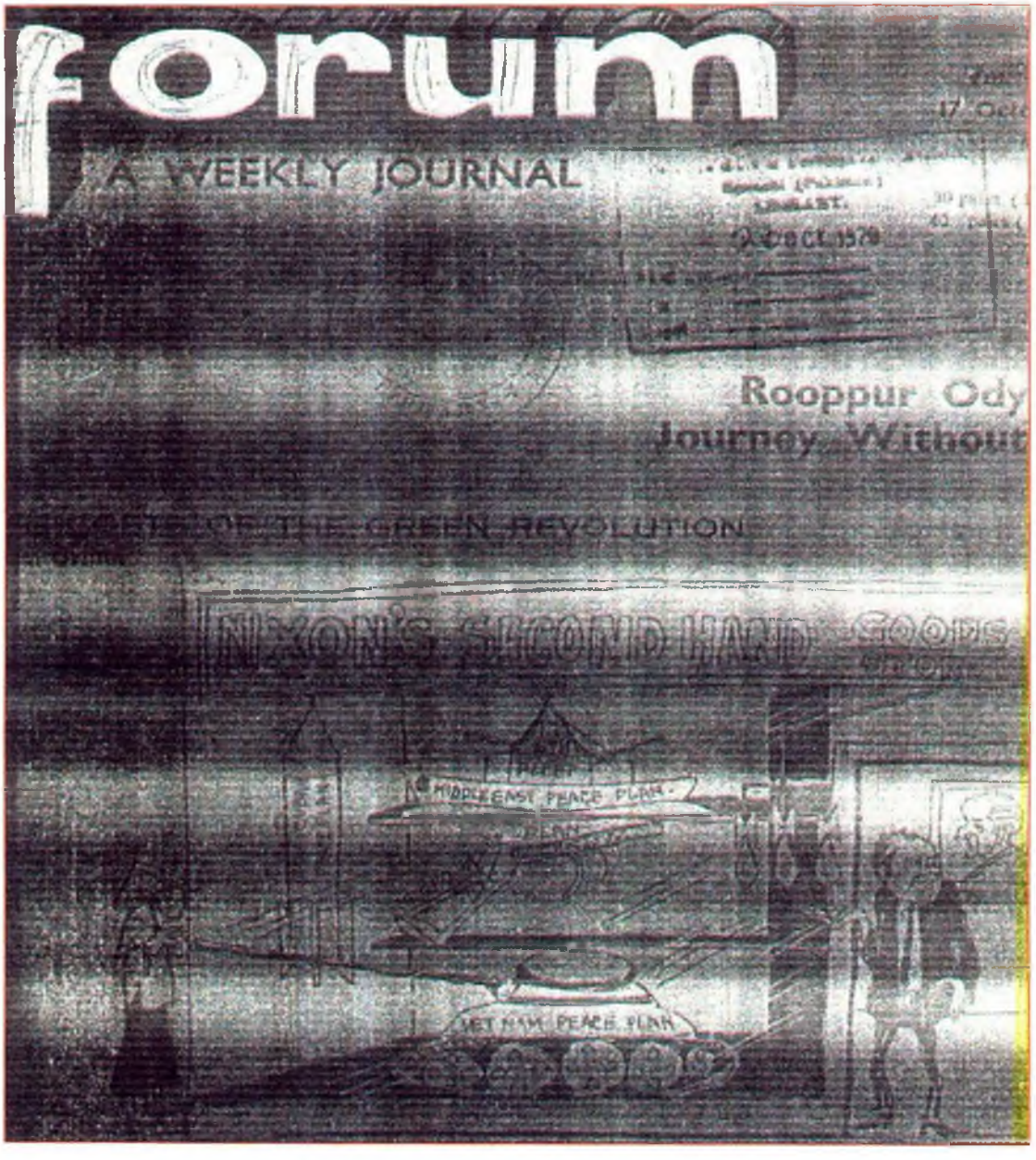

উপরোক্ত কার্টুনটিতে রনবী দেখিয়েছেন যে, পাশ্চাত্যের দেশ গুলি (এখানে আমেরিকা) কিভাবে একমুখে শান্তির পরিকল্পনার বুলি আওরাচেছন এবং অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধরত জাতিগুলোকে অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রির তথা উস্কানিমুলক কার্যক্রম চালাচেছ।

Dhaka University Institutional Repository

অন্য একটি কার্টুন, এটিও 'ফোরাম' পত্রিকা থেকে নেয়া। এতে দেখা যায়,

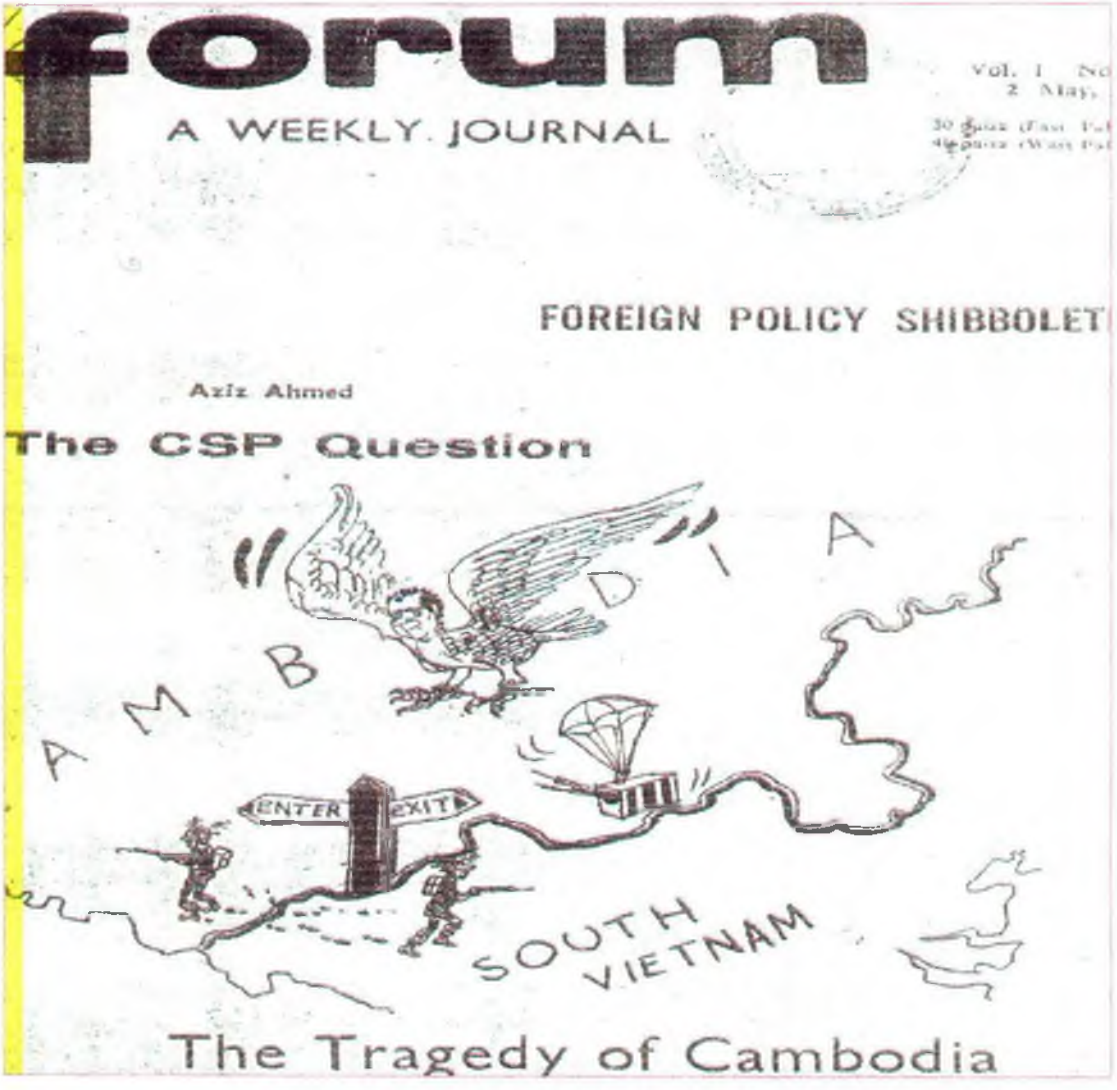

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন 'শান্তির দূত' রূপী 'পায়রা' হয়ে সে সময়কার অশান্ত কম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে এসেছেন শান্তির বার্তা নিয়ে। অন্যদিকে তিনি সাথে করে নিয়ে এসেছেন প্রচুর অস্ত্র সামগ্রী যুদ্ধে লিপ্ত দেশ দুটির জন্য। পশ্চিমা বিশ্বের একদিকে শান্তির কথা বলা এবং অন্যদিকে যুদ্ধে উস্কানি দেওয়া এই দ্বিমুখী নীতির পরিস্ফুটন ঘটেছে রনবীর অসাধারণ এই ব্যঙ্গচিত্রটির মধ্যে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. **ঘরোয়া**- রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঘরোয়া রাজনীতি। কারণ ঘরোয়া রাজনীতি থেকে সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রীয় এবং সেখান থেকে আন্তর্জাতিক বিষয়েও তা ছড়িয়ে পড়ে। তাই ঘরোয়া রাজনীতি নিয়ে রনবীর কার্টুন পাওয়া যাবে না তা ভাবাই যায় না। নিচে তাঁর অসাধারণ ঘরোয়া কার্টুনগুলোর দুটি আলোচিত হলোঃ

বাংলাদেশের ঘরোয়া রাজনীতিতে একটি বড় ব্যাপার হলো দল-বদল। অর্থাৎ দলে দলে ভাঙন এবং নতুন লোকের মাধ্যমে তা পূরণ করা। অত্যন্ত অমর্যাদাকর এই বিষয়টি ১৯৮০ সালের বিচিত্রায় রনবীর একটি কার্টুনে দেখানো হয়েছে।

কার্টুনটিতে, কতকগুলি বোতলের, মধ্য থেকে মানুষের মাথা বের হয়ে আছে এবং এসব ব্যক্তিরা এক বোতল থেকে আরেক বোতলে গমণ করছে। বোতলগুলির গায়ে লেখা আছে 'পার্টি'। অর্থাৎ রনবী এখানে দেখাতে চেয়েছেন এক পার্টি থেকে আরেক পার্টিতে রাজনীতিবিদরা যোগদান করছেন এবং পরবর্তীতে সুযোগ বুঝে অন্য পার্টির লোকেরা এই পার্টিতে যোগদান করছেন। সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদদের চরিত্রটিই তিনি এখানে তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অন্য একটি কার্টুনে রনবী এদেশের বিরোধী দলগুলির চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। ১৯৭৮ সালের ২৭শে অক্টোবর বিচিত্রার প্রচ্ছদে আঁকা অপর পৃষ্ঠার কার্টুনে তিনি দেখিয়েছেন--

এক ব্যক্তি তাঁর ছায়ার সাথে তলোয়ার যুদ্ধ করছেন। এর অর্থ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন বিরোধী দল হলেই সকলের চরিত্র এক হয়ে যায়। তারা বিরোধীতার খাতিরেই সরকারের সাথে বিরোধীতায় লিপ্ত হন। এরপর যখন তারা ক্ষমতায় আসেন তখন তাদেরকে একই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় প্রাক্তন সরকার ও বর্তমান বিরোধী দল দ্বারা। বাংলাদেশের বিরোধী দলগুলো যে তার সমগোত্রীয় লোকের সাথে চিরন্তন লড়াই করে চলেছে সেটাকে দেখানোর জন্যই এ কার্টুনের অবতারণা।

Dhaka University Institutional Repository

৪.দৈনন্দিন আলাপচারিতা- মানুষের দৈনন্দিন আলাপচারিতার ভিতর দিয়ে বের হয়ে আসে সেসময়কার রাজনীতির অবস্থা। বাংলাদেশের চায়ের আড্ডায় রাজনৈতিক ঝড় উঠানো একটি ঐতিহ্যের পর্যায়ে চলে গিয়েছে। তাই দেশীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষের কি অবস্থান তা এসব আলাপচারিতা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। রনবী এসব আলোচনাকে তাঁর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ বিষয়ের উপর দুটি কার্টুন বিশ্লেষিত হলোঃ-

প্রথম কার্টুনটি "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা থেকে নেয়া হয়েছে। কার্টুনটিতে এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বাংলাদেশের আবহাওয়া বদলের খবর শুনে বলছেন, তিনি ভেবেছিলেন এ আবহাওয়া রাজনৈতিক আবহাওয়া বদলের খবর। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ একই ধরণের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখে হাঁপিয়ে উঠেছে।

তারা নতুন কিছু আশা করছে । এ কারণে আবহাওয়া বদলের খবর ভেবে উক্ত ব্যক্তির মত কেউ কেউ আশান্বিত হয়ে উঠছিল।

Dhaka University Institutional Repository

আরেকটি কার্টুন এসেছে টোকাই থেকে। এটিও বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এখানে একজন লোক টোকাইকে শ্লোগান দিতে দেখে প্রশ্ন করছে- "কার পক্ষে শ্লোগান দিচ্ছিস?" টোকাই উত্তরে বলছে, "..সবতেরই পক্ষে"...

এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে টোকাইয়ের উত্তর, "সবতেইতো ভালা-ভালা কথা শুনাইতেছে..!!...তাই"

এই কার্টুনটিতে রনবী অসাধারণ সুন্দর ভাবে বাংলাদেশের রাজনীতির একটি দিক উপস্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের ভোট প্রার্থী রাজনীতিবিদগণ এদেশের সহজ-সরল লোকদেরকে ভোটের পূর্বে অসার বাণী ও অন্যান্য অনেক কিছুর আশা দিয়ে তাদের পক্ষে ভোট দিতে আগ্রহী করে তোলে। প্রায় প্রতিটি ভোট প্রার্থীর ভোটের আগে এমন আশা দেখানোর ফলে সবাইকে সাধু মনে হয়। এ কারণে কাকে ছেড়ে কাকে ভোট দেয়া যায় তা একটি চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

যদিও শেষ পর্যন্ত সবার মধ্যে সেই ভালো গুণ থাকে না। "কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরালে পাজি"- বাংলাদেশী রাজনীতিবিদদের এই চরিত্র নিয়ে যে টোকাইয়ের সাথে আরেক ব্যক্তির আলাপচারিতা, তা রনবীর কার্টুনে একটি অনবদ্য বিষয় হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. বৃহত্তর অর্থনীতি- অর্থনীতি একটি সমাজ বিজ্ঞান এবং সমাজবদ্ধ মানুষের অধিকাংশ কার্যাবলী অর্থের সাথে জড়িত। সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিমূল থেকে তৈরী হয় সকল সার্বজনীন অর্থনীতি। অপর দিকে এর ব্যত্যয় সমাজ রাষ্ট্র তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রকে করে তোলে কলুষিত ও সমাজে আনে বৈষম্য ও বিভেদ।

এই ক্ষেত্রে রনবীর কার্টুন প্রচলিত সমাজের কর্মধারায় রাজনৈতিক অবক্ষয় তথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতি দারুণ ভাবে কটাক্ষ করেছেন। সাম্যতার সমাজ ব্যবস্থা ও দৈনন্দিন জীবনের জটিলতা, মধ্যবিত্ত- নিম্নবিত্ত শ্রেনীর দ্বন্দ্ব, ইত্যকার নানাবিধ সমস্যা ও ঘটনার অবতারণা তার কার্টুনে বাস্তব ব্যাপ্তি লাভ করেছে। শাণিত তুলির রেখায় ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে শোষণ ও বৈষম্যহীন অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার আহবানে তিনি এক বিরাট মাত্রা যোগ করেছেন।

রনবীর অসংখ্য কার্টুনের ভিতর শুধুমাত্র টোকাইয়ের মাধ্যমে আর্থিক বৈষম্যের যে চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তা যুগের মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। 'টোকাই' চরিত্র সৃষ্টির ভিতর দিয়ে তিনি সারা বিশ্বের অসহায় নিগৃহীত কিশোরদের ছবি তুলে ধরেছেন। আর তার অকপট সংলাপগুলো সমাজের সকল শ্রেনীর মানুষের ব্যথা-বেদনায় গভীর অনুভূতির অনুরণন। টোকাইয়ের অভিব্যক্তি আর সংলাপগুলোর মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে উপ্ত হয়েছে বৃহত্তর অর্থনীতির সম্ভাবনার বীজ। রনবী শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবীর প্রেক্ষিতে ও সত্যিকার বৃহত্তর অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ার মানসে এক নীরব সংগ্রামের নেতৃত্বের পতাকাটি মিছিলের পুরোভাগে 'টোকাই'র হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এই সার্বজনীন আবেদনের ঢেউ অপরিসর মোহনা থেকে গভীর অতলান্তিকে গিয়ে পৌঁছবে এবং এখানেই তাঁর কাজ হয়ে আছে এবং থাকবে শ্বাশ্বত ও অমর।

বিশ্ব অর্থনীতিতে আমরা সর্বদা দেখি এক শ্রেনীর লোক সুবিধা পেয়েই যাচেছ আর এক শ্রেনী সমস্যার আবর্তে হাবুডুবু খেয়েই যাচেছ। অন্যদিকে এই সব সুবিধা ভোগী মানুষদের যখন শাস্তি দেবার চেষ্টা করা হয় তখন সেই শাস্তি শেষ পর্যন্ত এসব সুবিধা ভোগীদের ঘাড়ে পড়ে না বরং সমস্যায় পড়া সাধারণ লোকদের ঘাড়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

এই ব্যাপারটি রনবী একটি কার্টুনে চমৎকার ভাবে দেখিয়েছেন।

এই কার্টুনের খবরে দেখানো হয়েছে যে, "দূর্নীতি নির্মূল করতে ব্যর্থ হলে সাহায্য ছাটাই ..." বিশ্বব্যাংক। এই খবরটি দেখে এক দরিদ্র ব্যক্তির উক্তি"...কই নাই? ! সব শাস্তি পাবলিকগো উপর বর্তায়!!!!

বিশ্বব্যাংকের সাহায্য দিয়ে চলে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র মানুষেরা। কিন্তু যাদের অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে দূর্নীতি নির্মূল হয় না তাদের বাদ দিয়ে বিশ্বব্যাংক সাহায্য বন্ধ করে এই দরিদ্র মানুষগুলোকে শাস্তি দেবার হুমকি দিচ্ছে। এটিই এ কার্টুনে দেখানো হয়েছে।

অর্থনৈতিকঃ

যে কোন দেশের ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা একে অপরের পরিপূরক। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই রনবীর কার্টুনে সামাজিক অবস্থার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক চালচিত্রের রূপটিও অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। রনবীর অর্থনৈতিক কার্টুনগুলির মধ্যে দুটি ভাগ আছে। যেমনঃ

১. **ব্যয়োয়া**- অর্থনীতি 'Economics' গ্রীকশব্দ "ওইকোনোমিয়া" (Oikonomia) হইতে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ হলো গৃহস্থালী পরিচালনা। প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখ দার্শনিকের লেখা ও বক্তব্যের মধ্যেও অর্থনীতি বলতে গৃহস্থালী

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়কে বুঝিয়েছেন। এই আলোকে আমরাও ঘরোয়া অর্থনৈতিক ক্রিয়া কর্মের প্রাথমিক স্তর হিসেবে এবং আর্থিক কার্যক্রম বিন্যাসের প্রথম ক্ষেত্র হিসেবে পরিবারকে মূল্যায়ন করতে পারি। এই পরিবারকে ঘিরেই জীবন ধারণের বাস্তবতায় ঘরোয়া অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের পরিচয় আমরা পাব।

রনবীর কার্টুনে পারিবারিক অবয়বের এই ছোট পরিসরেও তিনি ঘরোয়া অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে এত জটিল ও সুক্ষ্ম গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা অন্য সকল কার্টুন থেকে স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যে বিশেষ মূল্যায়ন করতে হয়। পারিবারিক জীবন পরিচালনে অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের সমন্বয় সাধনের যে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে তার অনেক চিত্র কর্মের মাধ্যমে।

উল্লেখ্য তাঁর আর এক অনন্য সৃষ্টি নাম গোত্রহীন অনাথ বালক 'টোকাই' এর পরিবারহীন জীবন-যাপন পদ্ধতি ট্রাজেডী, ঘরোয়া জীবন বর্ননার ক্ষেত্রে শুধু করুণ অর্থনৈতিক অবক্ষয় আর এক অব্যক্ত দুঃখবোধের জন্ম দেয়। এর ভিতর দিয়ে তিনি এক নিষ্ঠুর পারিবারিক জীবন বিপর্যয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন।

বিশ্ব অর্থনীতির মত ঘরোয়া অর্থনীতিতে দেখা যায় একশ্রেনীর লোক অপর শ্রেনীকে চুষে খায়। এবং এর পরও তাদের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে আরো বেশী অপরকে চুষে খাবার। এতে ব্যর্থ হলে তারা প্রচন্ড ব্যথিত হয়। এই ব্যাপারটি রনবী দেখিয়েছেন সত্তরের দশকের একটি কার্টুনে-

Dhaka University Institutional Repository

'টোকাই' চাল ডাল ভর্তি অনেক বস্তার উপর মন খারাপ করে বসে থাকা এক মুনাফাখোরকে প্রশ্ন করছে.... জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে তো আপনার মন খারাপ কেন? ...আপনার তো পয়সার অভাব নাই, শুনি...। মুনাফাখোর বিক্রেতার উত্তর, "...মন কি সাধে খারাপ রে, ব্যবসার লাইগা যা 'ষ্টক' করছিলাম তাতে কুলাইতেছে না। ...কেন যে আরো 'ষ্টক'..করি নাই..."।

২. রাষ্ট্রীয়- রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক বুনিয়াদ একটি দেশে ও জাতির অস্তিত্বের পূর্ব শর্ত স্বরূপ। আধুনিক রাষ্ট্রের চালিকা শক্তির উৎসমূলে স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী অবকাঠামো অবশ্যই প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম অর্থনীতির বিভিন্ন শাখাগুলির সহযোগীতায় গড়ে উঠে। সরকারী আয়-ব্যয়, বাজেট প্রণয়ন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বেকার সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি বিষয়গুলির মোকাবিলা ও পরিচালনা রাষ্ট্রকেই করতে হয়।

কিন্তু রাষ্ট্রের এই বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ভিতর অনেক ক্ষেত্রে অবহেলা, ফাঁকি ও দূর্নীতি দেখা দেয়। এতে রাষ্ট্র আর্থিক এবং কাঠামোগত দিক থেকে অনেক দূর্বল ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। রনবী তাঁর কার্টুনে সচেতন রাষ্ট্রীয় চেতনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল স্তরের ভালো-মন্দ মানুষের বিশেষ কার্যাবলী প্রতিফলিত করে সমাজকে প্রতিনিয়ত প্রতিবাদমুখী এবং সোচচার করে তুলেছেন। এখানে রাষ্ট্র প্রধান থেকে সমাজের কালো বাজারী পর্যন্ত তাঁর তুলির রেখায় প্রতিভাত হয়েছেন। রাষ্ট্রীয় আঙ্গিকে তাঁর এই কার্টুনের ভূমিকা অপরিসীম।

১৯৮০ সালে রনবীর রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ভিত্তিক কার্টুন ছাপা হয়েছিল সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'য় এতে এক কিশোর টোকাইকে জিজ্ঞাসা করে বলছে-

Dhaka University Institutional Repository

"আমাদের দেশে তেল পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে...জানিস?... "উত্তরে 'টোকাই' বলছে, "জানি। বিদেশীগো 'মিসকিন' কওনের সমান ... সম্ভাবনা আছে কিনা... সেইটা কও..."।

অর্থাৎ উপরোক্ত কার্টুনটিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে বিদেশীদেরকে অর্থাৎ যারা আমাদের ফকির, মিসকিন বলে তাদেরকে উল্টো ফকির, মিসকিন বলা অসম্ভব তাই বুঝিয়েছেন রনবী।

বাংলাদেশের মত অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য বৈদেশিক সাহায্যকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সবসময়ই একটি আবশ্যকীয় এবং প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর হতে পুর্নগঠন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অর্থসংস্থান করবার জন্য বাংলাদেশকে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করতে হয়। প্রথম দিকে অনুদান হিসেবে টাকা পাওয়া যেত বেশী পরে অনুদান কমে ঋণ গ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশকে দেওয়া বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ৯০ শতাংশ ছিল অনুদান; বাকী দশ ভাগ ঋণ। অপর দিকে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে প্রাপ্ত সাহায্যের ৫৩.২০ শতাংশ ঋণ এবং ৪৬.৮০ শতাংশ অনুদান। তবে এখানে মর্মান্তিক ব্যাপারটি হচেছ ঋণের অধিকাংশ টাকা অতীতে নেয়া ঋণের সুদ মেটাতে ব্যয় হয়ে যায়। বিশ্ব ব্যাংকের এক হিসেবে দেখা যায়, ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ যে ঋণ নিয়েছে তার কিস্তি এবং সুদ বাবদ ১৯৯৮ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ১৯ বছরে তাকে মোট ১৩৮৪ কোটি ৭৬ লক্ষ ৪৫ হাজার মার্কিন ডলার পরিশোধ করতে হবে।[৩]

প্রতি বছর গড়ে পরিশোধ করতে হবে ৭২ কোটি ৭৮ লক্ষ ৯৭ হাজার ডলার।[৪] তবুও বকেয়া ঋণ প্রচুর পরিমাণে থেকে যাবে। যুক্ত হবে নতুন ঋণ। সুতরাং ঋণ এখন বাংলাদেশের জন্য 'মাদকাশক্তি' হিসেবে দেখা দিচেছ। বৈদেশিক ঋণ বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখেনি।

---

৩. ২০শে ডিসেম্বর ১৯৯৮, 'দৈনিক ইত্তেফাক'।

৪. ৫ই মে, ১৯৯৮, 'দৈনিক মুক্তকণ্ঠ'।

Dhaka University Institutional Repository

রনবীর কার্টুনের উৎসসমূহ

শিল্প সংস্কৃতিকে আমরা তুলনা করতে পারি একটি খরস্রোতা নদীর সাথে; যে নদীর ধর্ম হচ্ছে কেবলই বয়ে চলা। তবে যত দূর পর্যন্তই নদীর বিস্তৃতি হোক না কেন এর মূল ধারাটি কিন্তু বাঁধা থাকে এর উৎস সাগরের সাথে। শিল্পের একটি মাধ্যম হিসেবে কার্টুনের সুনির্দিষ্ট কিছু উৎস থাকে। একজন আদর্শ কার্টুনিষ্ট হিসেবে রনবীও তাঁর কার্টুনগুলিকে বিশেষ কিছু উৎস থেকে ছেঁকে তোলেন। এখানে সেই উৎসগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হলোঃ

সংবাদকেন্দ্রিক উৎস

সংবাদপত্রে অনেক সময় এমন অনেক খবর ছাপা হয় যা হয়তো আমরা খুব বেশী গুরুত্বের সাথে নেই না কিংবা আমাদের মনে তেমন ছাপ ফেলে না। কিন্তু সেই সংবাদটিকে যখন রনবী তাঁর নিপুণ দক্ষতায় কার্টুনের সাহায্যে খানিকটা ব্যঙ্গ ও খানিকটা রসের সমন্বয় ঘটিয়ে তুলে ধরেন তখন সেই সংবাদটি সম্পর্কে সকলে স্বভাবতঃই কৌতুহলী হন এবং সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠে। আর এভাবেই তিনি আমাদের সচেতন করে তোলেন এমন অনেক বিষয় সম্পর্কে যা হয়তো তাঁর কার্টুনে উপস্থাপিত না হলে আমাদের অগোচরেই থেকে যেত। কিংবা সম্মুখে থেকেও আড়ালে থেকে যেত। সুতরাং সেই হিসেবে বলা যায় রনবীর কার্টুনের উৎস হিসেবে সংবাদপত্র একটি অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম।

রনবীর সংবাদ ভিত্তিক কার্টুনের মধ্যে একটি দেখানো হয়েছে যে, একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে, যাতে বলা আছে "বৃহত্তর রংপুরে পিঁয়াজের বাজারে আগুন"। খবরটি দেখে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলছেন.. " না নিভা পর্যন্ত খাওনের কাম নাই। ....."

অর্থাৎ দাম না কমা পর্যন্ত যত দরকারই হোক পিঁয়াজ কিনার প্রয়োজন নেই। আয় সীমিত অথচ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের দাম যেভাবে বাংলাদেশে বেড়ে চলে তাতে করে যত প্রয়োজনই হোক তা কেনার সামর্থ্য সাধারণ মানুষের নেই ব্যাপারটিই বোঝানো হয়েছে কার্টুনটিতে।

রনবীর অসংখ্য কার্টুনের সৃষ্টি হয়েছে সংবাদের উপর নির্ভর করে। তাঁর সংবাদভিত্তিক কার্টুনগুলোতে একটি ছাপা হয় এবং সেই খবরের উপর নির্ভর

Dhaka University Institutional Repository

করে জনসাধারণের উক্তি তথা রনবীর সৃষ্ট মন্তব্যগুলো দিয়েই তৈরী হয় রনবীর কার্টুন। এরকম আর একটি কার্টুন নিম্নে দেয়া হলোঃ-

এই কার্টুনটিতে যথারীতি একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছেঃ--"সেলাই মেশিনের প্যাকেটে এসেছে দু'শ অস্ত্র"

এই খবরের প্রেক্ষিতে এক ব্যক্তির উক্তি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে সমাজে সিলাই করা যায় যদি তাই!!! সেলাই মেশিনের কাজ হচেছ সংযুক্ত করা। উপরোক্ত কার্টুনটিতে এটাই বোঝান হয়েছে যে, এসব অস্ত্র এসে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে সমাজের সাথে যুক্ত করে রাখবে। এবং রনবী তাঁর কার্টুনের মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হওয়া উচিত এই ব্যাপারটি সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আর একটি সংবাদকেন্দ্রিক কার্টুন বিশ্লেষিত হলোঃ

একটি কিশোর টোকাইকে বলছে যে, "খবরে পড়লাম কেউ কালোবাজারী, মজুতদার, মুনাফাখোর প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে..."।

এর উত্তরে টোকাই বলছে "..খবরটা তো তারাও এতদিনে পইড়া ফালাইছে.."

অর্থাৎ টোকাইয়ের উত্তরের মধ্য দিয়ে কার্টুনিস্ট রনবী এখানে বুঝাতে চেয়েছেন খবর সাধারণ মানুষ পায় তথ্য হিসাবে। সেই খবরটি অপরাধীরা ও পেয়ে থাকে একই ভাবে এবং এই খবর দেখে তারা সাবধানও হয়ে যায়। ফলে তাদের শাস্তি দেওয়া সমস্যা হয়ে দাড়ায়। শুধু ঢাকঢোল পিটালেই চলবে না অপরাধীদের দমন করতে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন এবং কার্যকরী করতে হবে।

অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক উৎস

মূলতঃ একজন কার্টুনিস্টের কার্টুনের উৎস কেবলমাত্র প্রচলিত জোক্স বা সংবাদ মাধ্যমগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলে না। তাকে তাঁর তৃতীয় নয়নের সাহায্যও নিতে হয় প্রায়ই। প্রতিদিন বিভিন্ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত থাকায় যে সব মজাদার অথচ গুরুত্ববাহী ঘটনা ঘটে সেসব

Dhaka University Institutional Repository

নিয়েও কার্টুন হতে পারে। ঠিক তেমনি রনবীও তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় সচল রেখে তাঁর আটপৌরে জীবনের চারপাশ থেকে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, যাকে তিনি তাঁর কার্টুনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করে কলমের আঁচড়ে বাঙময় করে তোলেন। এরকমই দুটি কার্টুন নিচে বিশ্লেষিত হলোঃ

প্রথমে যে কার্টুনটির কথা বলা হচেছ তার মুখপাত্র সেই বিখ্যাত চরিত্র 'টোকাই'। ১৯৮০ সালে বিচিত্রায় প্রকাশিত এই কার্টুনে এক ভদ্রলোক টোকাইকে জিজ্ঞাসা করছে--

...যা ইচছা অই দাম বাড়ানো যায় কখন বল দেখি....

জবাবে টোকাইয়ের বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর-

....রোজার মাসে!! .... ।

প্রতি বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে ব্যবসায়ীদের রোজার মাসে জিনিসপত্রের আকাশ ছোঁয়া দাম বাড়ানোর প্রতিযোগিতার প্রতি দৃষ্টি রেখে রনবী এই কার্টুনটি করেছেন।

পরের কার্টুনটিও ১৯৭৩ সালে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই কার্টুনে রনবী কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার করুণ অবস্থা চিত্রিত করেছেন। কার্টুনটিতে শতছিন্ন কাপড় পরিহিত একজন পাগল প্রায় ধরণের লোককে দেখা যাচেছ এবং অল্প দুরে দাঁড়িয়ে দুজন ব্যক্তি ঐ পাগল ব্যক্তি সম্পর্কে আলাপ করছে যে- "ভদ্র লোক সম্প্রতি গোটা তিনেক মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন"।

Dhaka University Institutional Repository

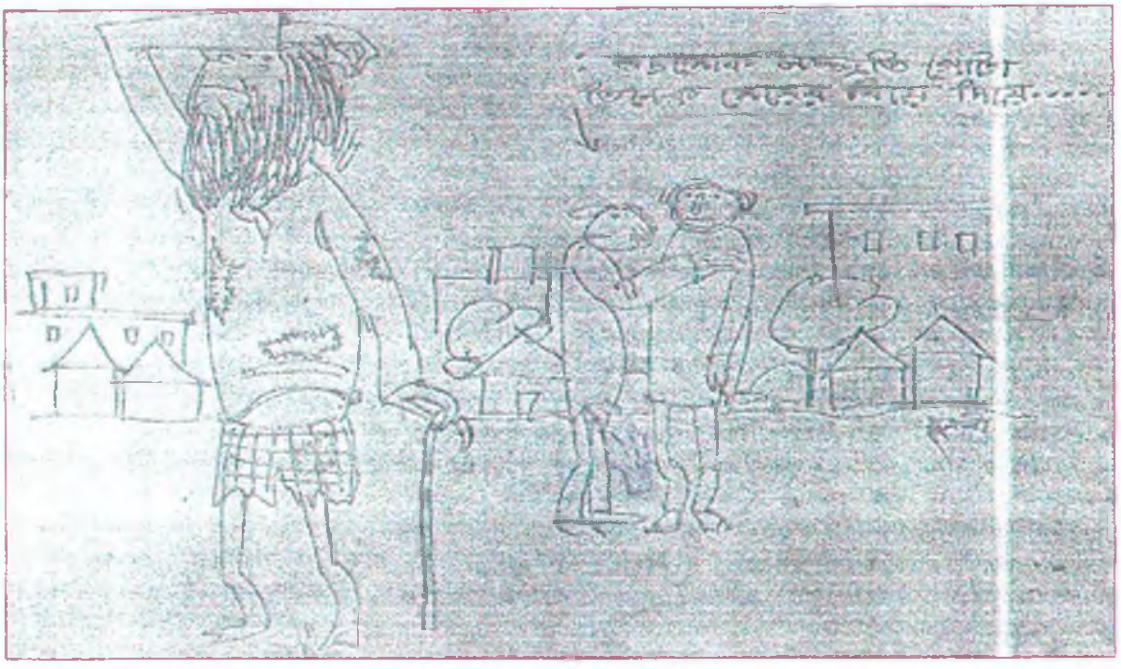

রনবী আমাদের সমাজের বিভিন্ন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত পারিবারিক অবস্থায় চোখ বুলিয়ে দেখতে পেয়েছেন এমন অনেক কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে যারা তাদের মেয়ের বিয়ের খরচ ও পাত্র পক্ষ যৌতুকের লালসা মেটাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে উন্মাদপ্রায়। এটি আমাদের বাংলাদেশে একটি অতি পরিচিত ঘটনা। রনবী তাঁর করুণ অভিজ্ঞতাই উপরোক্ত কার্টুনটিতে তুলে ধরেছেন।

প্রচলিত জোক্স

কৌতুক সম্বলিত চুটকি সাধারণতঃ মানুষের মুখে মুখে অথবা লেখনীর মাধ্যমে প্রচলিত থাকে। দেখা যায় সমসাময়িক কোন ঘটনার সাথে সংগতিপূর্ণ কোন জোক্ কার্টুনের মাধ্যমে যখন ঐ ঘটনাকে উপস্থাপন করে তখন ঘটনাটি আমাদের চোখের সামনে আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে দেখা যায় যা কিনা অসংখ্য কথার ফুলঝুড়ি দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। তাই রনবী তাঁর কার্টুন গুলি আরো বেশী আকর্ষণীয় করতে প্রচলিত জোক্সকে উৎস হিসেবে নিয়েছেন।

প্রচলিত কথকতা থেকে রনবী যেসব কার্টুন এঁকেছেন তার মধ্যে নিচের কার্টুনটি বেশ উল্লেখযোগ্য এটি সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয় সত্তরের দশকে।

Dhaka University Institutional Repository

কার্টুনের মূল চরিত্র সেই আদি এবং অপরিবর্তিত 'টোকাই'।

এখানে দুটি কাক 'টোকাই'কে খুব দুঃখ করে বলছে- "মানুষেরা আমাগো মোটেই পাখি মনে করে না"। অত্যন্ত সহানুভূতি এবং সহমর্মি সুরে 'টোকাই' তাদের সান্ত্বনা দেয় এই বলে- "দুঃখ করিস না। হ্যাগো অনেকেই আমাগো মতনগুলারে মানুষ মনে করে না' আমাদের দেশের অতি পরিচিত একটি কথা হচেছ- "চামচিকাও পাখি তুইও মানুষ" এই প্রবাদের সুত্র ধরেই মূলতঃ উল্লেখিত কার্টুনটি আঁকা হয়েছে । অর্থাৎ আমাদের দেশের ছিন্নমূল পর্যায়ের মানুষেরা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া তো দূরে থাক মানুষ বলেও স্বীকৃতি পায় না।

এই জাতীয় আরেকটি কার্টুনের কথা আমরা জানতে পারি ১৩ জুন ১৯৭০ সালে প্রকাশিত রেহমান সোবহান সম্পাদিত 'ফোরামে'র প্রচছদে কার্টুনটি আঁকা হয়েছিল চতুর্থ পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনাকে ঘিরে । পর পর তিনটি পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পরেও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যে একটি প্রহসন বৈ আর কিছুই ছিল না তা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরাই ছিল এ কার্টুনের মূল বক্তব্য।

Dhaka University Institutional Repository

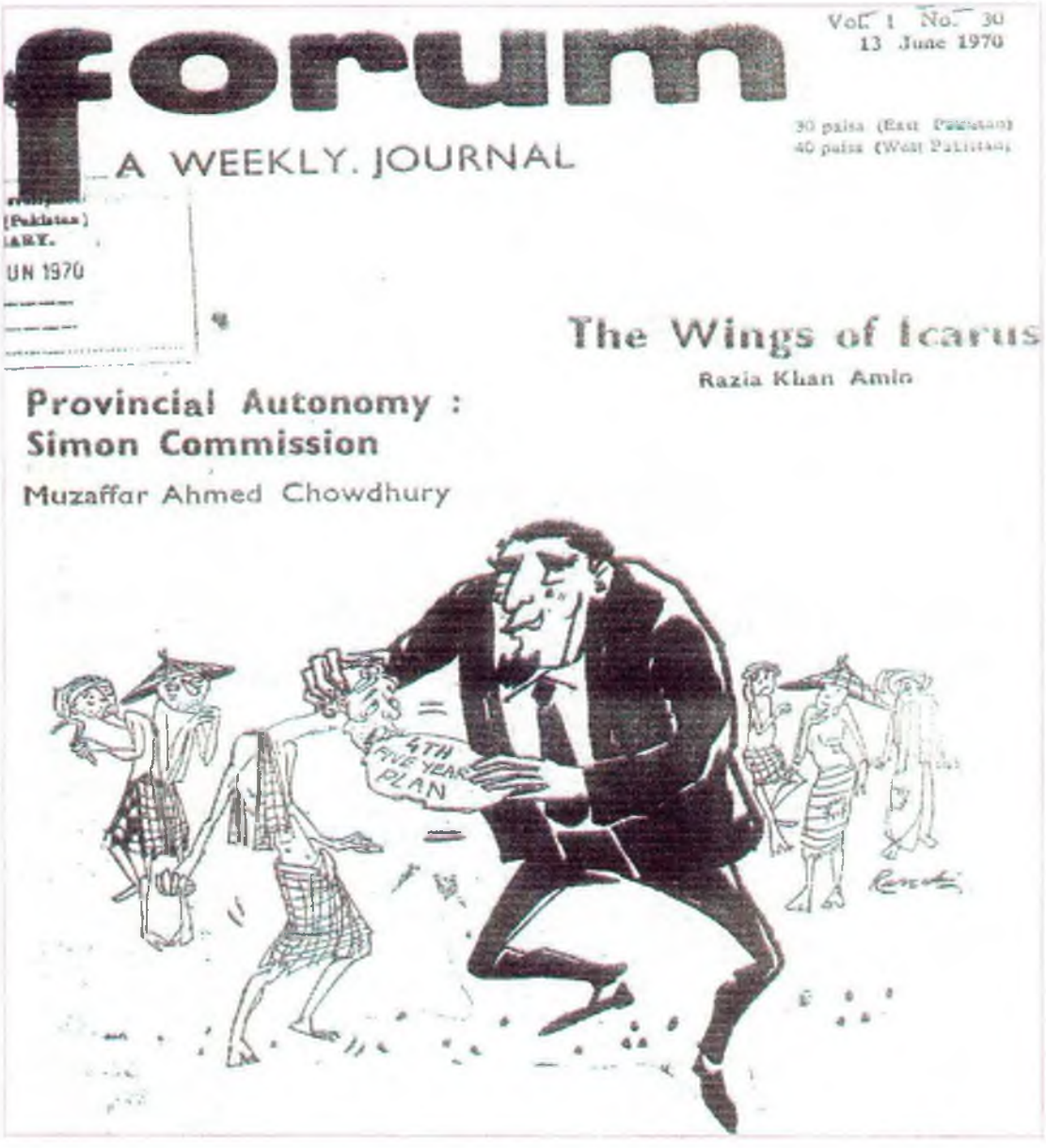

পাচ্ছি

এখানে আমরা দেখতে সমাজের একজন কর্তাব্যক্তি জোর পূর্বক কৃষক-শ্রমিক অর্থাৎ দেশের খেটে খাওয়া মানুষকে গলধঃকরণ করাচ্ছেন চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নথিপত্র। এতে তাদের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হবে এটা যেন তারা বুঝেও বুঝতে পারছেন না। কেননা এসব পরিকল্পনার ফলে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত টাকার সিংহভাগ সমাজের দন্ডমূর্তদের পকেটস্থ হয়। তাই এসব অর্থহীন পরিকল্পনার দিকে তাদের ঝোঁকটা একটু বেশীই থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

400454

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বহুল প্রচলিত ছোট গল্প "তোতা কাহিনীর" ছায়া অবলম্বনে রনবী কার্টুনটি এঁকেছেন। গল্পটিতে খেয়ালি রাজা তার খেয়ালের বশে একটি তোতাকে বন্দী করে তার কর্মচারীদের নির্দেশ দেন পাখিটিকে শিক্ষিত করে তোলবার জন্য। স্বভাবতই কর্মচারীরা খুব আগ্রহের সাথে ব্যস্ত হয়ে পড়ে পাখিকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করে গড়ে তোলার কাজে। বলা বাহুল্য এ কাজের জন্য তারা প্রত্যেকে পেতে থাকে প্রচুর পরিমান ধনরত্ন। শেষ পর্যন্ত পুথি-পুস্তকের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাখিকে গেলানোর কারণে একদিন পাখিটির কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। মারা যায় পাখিটি। রবীন্দ্রনাথের এই গল্পের মত একই উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছে রনবীর কার্টুনেও। আরো দুটি কার্টুন চিত্র দেয়া হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

কার্টুনে প্রতিফলিত সমাজ ও অর্থনৈতিক চিত্র

(স্বাধীনতা পূর্বকাল)

শিল্পকর্মের মাধ্যমে সমাজ, সময় ও তার অবস্থা তুলে ধরা অত্যন্ত কঠিন কাজ। শিল্পী তার শিল্পকর্মের মাধ্যমে এই কাজটি চমৎকার রূপে সম্পন্ন করেন। তুলে ধরেন সময়কে জনগণের সামনে। অতীতের অভিজ্ঞতায় বর্তমানকে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য নির্মাণ করেন তার অনন্য সাধারণ শিল্পকর্ম। রনবী (রফিকুন নবী) এমনই এক শিল্পী যিনি প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরে তাঁর নিজস্ব কর্মক্ষেত্র কার্টুন চিত্রের মাধ্যমে তাঁর সময়কে অত্যন্ত জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন। ফুটিয়ে তুলেছেন সমাজের নানা অসঙ্গতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য, দূর্নীতি সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ইত্যাদি বিষয়।

স্বাধীনতার পূর্বে অর্থাৎ ষাটের দশক থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত সময়ের রনবীর কার্টুনে প্রতিফলিত সমাজ ও অর্থনৈতিক চিত্রের উপর নীচে আলোকপাত করা হলোঃ

অর্থনীতি- মানুষের সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয় অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে। মানুষের সকল প্রচেষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য অধিকতর আরামদায়ক ও স্বচ্ছল জীবন-যাপন করা। ব্যক্তির সমষ্টি হচ্ছে সমাজ। আর সমাজের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র পরিচালিত অর্থনীতিও মানুষের কল্যাণে নিবেদিত। আর এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের তথা সরকারের পরিকল্পণা প্রণীত হয়।

কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। দীর্ঘ প্রায় দুই শত বৎসর ইংরেজদের পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে দ্বিজাতি তত্ত্বের (বিতর্কিত তত্ত্ব) ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত হলো। মুসলিম প্রধান এলাকা নিয়ে হলো পাকিস্তান-পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। আশা করা হয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে পাকিস্তান পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু অচিরেই এই স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অদূরদর্শিতা, অপরিনামদর্শিতা, আঞ্চলিক মানসিকতা এবং আরও বহুবিধ কারণে দুই পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ একে অপরের শত্রুতে পরিণত হলো এবং জনগণের মাঝে হতাশা কাজ করতে শুরু করলো। এর

Dhaka University Institutional Repository

অনিবার্য ফল হিসাবে দেখা দিল পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণ যার প্রভাব মারাত্মক হয়েছিল অর্থনৈতিক বৈষম্যের মধ্য দিয়ে।

১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর প্রথম দিকে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে তেমন বৈষম্য ছিল না। যদিও পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুই অংশের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার দরুণ পার্থক্য বিরাজমান ছিল। পাকিস্তানের দুটি অংশ একই শাসন ব্যবস্থার অধীনে থাকলেও দুটি অংশের অর্থনৈতিক কাঠামো ও ক্রমবিকাশ সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে শুরু হয়।

পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভৌগলিক ও প্রকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। অধিকাংশ কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে উঠেছিল। পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী কাঁচামালের যোগানদাতা এবং পশ্চিম পাকিস্তান উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার হিসাবে ব্যবহার করতো যা কিনা ঔপনিবেশিক মানসিকতার পরিচয় বহন করে। যা আদৌ কাম্য ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সব সময় পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে থাকায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প উন্নয়ন প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব ও সরকারী আনুকূল্য লাভে বঞ্চিত হয়। এমনকি বহু নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্পপণ্যের জন্য তখন পশ্চিম পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হতো। দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর পাকিস্তান সরকার কর্তৃক অনুসৃত বৈষম্যমূলক শাসন ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক নীতির ফলে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক পার্থক্য ও বৈষম্য হ্রাস না পেয়ে বরং বাড়তেই থাকে। ১৯৬২ সালের তথাকথিত শাসনতন্ত্র ও পাকিস্তান সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে দুই অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা স্বীকার ও বৈষম্য হ্রাসের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে এই বৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

১৯৫৯-১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে আঞ্চলিক বৈষম্য মোটামুটিভাবে স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু তারপরে পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে থাকে। দুই অংশের মাঝে বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাকিস্তানে তখন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় পূর্ব পাকিস্তানের মোট আঞ্চলিক উৎপাদন প্রতিবছর শতকরা ৫.৩ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে আঞ্চলিক

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতিবছর শতকরা ৫.৪ ভাগ হারে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় পূর্ব পাকিস্তানে মোট আঞ্চলিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৪.১ ভাগ হারে। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে একই সময়ে আঞ্চলিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৬.১ হারে।[১]

১৯৫০-১৯৫১ থেকে ১৯৬৯-৭০ এই দুই দশক পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত খাতে উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩১৩০.৩ কোটি টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে একই সময়ে একই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬২৮১.৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত অর্থের দ্বিগুনেরও বেশী। অর্থনীতির অবকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যয়ের স্বল্পতার কারণে অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি কোন সময়েই এই অঞ্চলে তেমন দৃঢ় হতে পারেনি।

বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল পূর্ববাংলার অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদতা অব্যাহত রাখার আর একটি কৌশল। ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালে এই দুই দশকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২৩৩৩.৩ কোটি টাকা। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১৯৪৭.৬ কোটি টাকা। একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে আমদানীর পরিমাণ ১৯২৬.১ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৪০১৯১.৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের পরিমাণ ছিল শতকরা ৫৬ ভাগ কম।

১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৯-৬০ দশকে বাংলাদেশ বৈদেশিক সাহায্য হিসাবে পেয়েছে ৯৩ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তান পেয়েছে ৪০৮ কোটি টাকা। পরবর্তী কালের চিত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

পূর্ব পাকিস্তানকে (বাংলাদেশকে) শোষণ করার আরেকটি হাতিয়ার ছিল আন্ত:বাণিজ্য। ১৯৫০-৫১,১৯৫৯-৬০ এই দশকে বৈদেশিক ও আন্ত: বাণিজ্যের হিসাব নিকাশে দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানের হিসাবে উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১৬৬.৬ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের হিসাবে ঘাটতি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩৩১.৬ কোটি টাকা।[২]

---

১. Source: Rehman Sobhan, The Balance Sheet of Disparity, The Forum, 14th Nov, 1970.
২. 'রক্তাক্ত বাংলা' গ্রন্থ থেকে পৃষ্ঠা নং-৮৩

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী আমাদের দেশকে প্রায় ২৫ বছর শাসন শোষণ করেছে এসময়ের মধ্যে দেশে কিছু রাস্তা-ঘাট, কল-কারখানা তৈরী হলেও এ অঞ্চলের অর্থনীতির মৌলিক উন্নতি সাধিত হয়নি। পূর্ব-পাকিস্তান বরাবরই কৃষি নির্ভর অর্থনীতির দেশ। অথচ সেই কৃষি খাতেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। উন্নত বীজ, কীটনাশক, সেচ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। পাশাপাশি ভূমি ব্যবস্থার মৌলিক কোন পরিবর্তন না হওয়ায় গরীব ও মেহনতি মানুষের ভাগ্যের যেমন কোন পরিবর্তন হয়নি তেমনি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এসময়ে তেমন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে ভূমিহীন শ্রেনীর সংখ্যা তখন থেকেই বাড়তে থাকে। আর গরীব আরও গরীব এবং ধনী আরও ধনী হতে থাকে। শ্রেনী বৈষম্য প্রকটতর হতে থাকে। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ দূর্নীতির বিস্তার ঘটে ব্যাপক হারে। এই বিষয়গুলোই রনবী তাঁর কার্টুনের বিখ্যাত চরিত্র 'টোকাই'-এর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এমনই একটি কার্টুন নিম্নরূপঃ

একজন ভদ্রলোক বলছে,

এদিকে হা করে কি দেখছিস?

টোকাই-....না... এই দেখতাছি। দ্যাশে খরায় ফসল না গজাইলে কি হইবো,.... মাইনসের বিল্ডিং তো গজাইতেছে. . .

দেশে কৃষি ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ খরার সময় মাঠ-ঘাট শুকিয়ে কাঠ। সেচ প্রকল্পের প্রসার ঘটেনি।

Dhaka University Institutional Repository

ফসল উৎপাদনে মারাত্মক ঘাটতি অবধারিত। সামনে কৃষকের দূর্দিন। সেদিকে সরকার মহলের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। এক শ্রেনীর অসৎ রাজনৈতিক নেতা, অসাধু সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী তাদের দূর্নীতি এবং লুটপাটের দোকান খুলেছে। ক্ষেতে কৃষকের ফসল খরায় নষ্ট হচেছ অথচ তারা তাদের দূর্নীতির ঘোড়া বল্গাহীন ভাবে ছেড়েছে। আর তাদের দূর্নীতি, অসততার প্রমাণ হিসাবে ঐ বিশাল বিশাল অট্টালিকাগুলো যেন গরীব মেহনতি কৃষক শ্রমিকের দিকে মুকব্যদন করে তাকিয়ে আছে। উপরোক্ত কার্টুনটিতে রনবী এই বিষয়টিই অত্যন্ত চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে পশ্চাৎপদ অর্থনীতির অনিবার্য ফল হিসাবে চোরাচালান, কালোবাজারীতে দেশ ছেয়ে যায়। কালোবাজারের কারণে দেশের অর্থনীতি আরও খারাপ হতে থাকে। কালোবাজারীদের বিষয়টিও রনবীর কার্টুনে এড়ায়নি। এই নিয়ে একটি কার্টুনঃ

একজন কালোবাজারী তার সন্তানদেরকে বলছে-"দেহ পোলারা কালোবাজারী বইলা আমার ১৪ বছর হইবার পারে। আমি না থাকলেও বাপ-দাদার ব্যবসাটা যেন বন্ধ না হয়....।"

কালোবাজারীর শান্তি এবং এ থেকে লুটপাটের সুবিধা সম্পর্কে সে অবহিত। অর্থাৎ কালোবাজারী তার অসৎ ব্যবসা সম্পর্কে অনুতপ্ত তো নয়ই বরং এই ব্যবসার প্রতি তার ছেলেদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে। ন্যুনতম দেশপ্রেম, নৈতিকতা এসব লোকদের মধ্যে ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

এইভাবে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈষম্য, অসততা রনবী তাঁর কার্টুনে প্রতিফলিত করেছেন এবং স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশে পশ্চিমা শাসক-শোষকদের শাসন শোষণ ও বৈষম্যকে তুলে ধরেছেন।

শিক্ষা- পাকিস্তান আমলে গোটা পাকিস্তানেই শিক্ষার করুণ অবস্থা ছিল। শিক্ষার হার ছিল সার্বিক ভাবে ১৪%। শিক্ষা বিস্তারে অন্ধকার কুসংস্কার গোড়ামী দূর করার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি সেসময়। এমতাবস্থায় পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করতে পিছপা হয়নি। এ প্রসঙ্গে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে----

১৯৯৯ সালের ২৬ মার্চ T.S.C (D.U) এর সড়ক দ্বীপে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে। উক্ত অনুষ্ঠানের অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বিমান বাহিনী প্রধান এ, কে খন্দকার। তিনি তাঁর স্মৃতিচারণ মূলক বক্তৃতায় বলেন, তৎকালীন পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা কার্যক্রম, পাঠ্যসূচী পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশী কঠিন ছিল। ফলে নম্বর প্রাপ্তিতে এ অঞ্চলের লোকজন পিছিয়ে পড়ত এবং চাকুরীতে এর প্রভাব পড়ত। কিন্তু যারাই সুযোগ পেয়েছে তারাই বুঝতে পেরেছে যে পশ্চিমাদের তুলনায় এ অঞ্চলের ছাত্রদের মেধা অনেক উন্নত (তাঁর কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায়) ছিল।

শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ফলে শিক্ষার উন্নয়ন যেমন হয়নি তেমনি বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায়ও ছিল নানা সমস্যা। শিক্ষকদের অবস্থা তথা অর্থনৈতিক সামাজিক মর্যাদা ছিল না এদেশে। বৃটিশ আমলে পন্ডিতদের কিছু দাপটের কথা শোনা গেলেও তা প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে না। শিক্ষকদের করুণ অবস্থা নিয়ে রনবীর এই কার্টুনটি সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছিল। কার্টুনটি এরকমঃ

অপরিচ্ছন্ন জীর্ণ পুরাতন পাঞ্জাবী ততোধিক জরাজীর্ণ চটি স্যান্ডেল, কাঁধে চটের পুরনো ব্যাগ, পুরনো ছাতা হাতে কেউ একজন যাচেছন। তা দেখে দুই কিশোরের কথোপকথন, " হাল দেখেতো মনে হয় মাস্টার মতন কিছু হবেন"।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ একজন স্কুল মাস্টারের অবস্থা এর চাইতে উন্নত হতে পারে না এটা ছোট কিশোরও বুঝে গিয়েছে। এঁদের অবস্থা যেন এমনই হওয়ার কথা। এই কার্টুনের নির্মম রসিকতার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার ভাবে ভেসে উঠেছে এদেশের শিক্ষকদের করুণ অবস্থা। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড । এই মেরুদন্ডের কারিগরদেরই যদি এহেন অবস্থা হয় তবে শিক্ষার অবস্থার কথা আর বেশী বলার প্রয়োজন পড়ে না।

অন্যদিকে শিক্ষকবৃন্দ অর্থনৈতিক দৈন্যতা থেকে মুক্তির জন্য নানাবিধ কাজে জড়িয়ে পড়েন বলে শিক্ষকতা ব্রত না হয়ে পেশায় পরিণত হয়। অপরদিকে ছাত্র রাজনীতিতেও ক্রমে ক্রমে লেজুড়বৃত্তি প্রবেশ করে এবং এর ফলস্বরূপ সন্ত্রাসের বীজ রোপিত হয়। গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলন ছাত্র জনতার দাবী আদায়ের সংগ্রামকে নসাৎ করার জন্য পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী এন. এস.এফ এর ভাড়াটে গুন্ডাদের লেলিয়ে দেয়। সন্ত্রাসের যাত্রা তখন থেকে। আবার শিক্ষায় বৈষম্যও লক্ষ্যনীয়। যদিও বাংলাদেশ আমলেই শিক্ষায় বৈষম্য অর্থাৎ নানা ধরণের শিক্ষা যেমন সাধারণ শিক্ষার মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা, কিন্ডার গার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম ইত্যাদি বহু দর্শণে বিভক্ত শিক্ষার বিকাশ ঘটেছে তবুও এটির গোড়াপত্তন হয় পাকিস্তান আমলেই। তখনও ধনীক শাসকগোষ্ঠীর সন্তানেরা ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তো। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে কোন সময়ই পূণার্ঙ্গ রূপ পায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি- বাঙালী সংস্কৃতি সুদীর্ঘ কালের। আবহমান কাল ধরে এখানকার মানুষ একই ধরনের সংস্কৃতি চর্চা করে এসেছে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে একে অপরের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এখানে ধর্মীয় সংস্কৃতিকে করেছে হৃদ্য। আপামর জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রায় অভিন্ন অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই সংস্কৃতির উপরই সর্বপ্রথম আঘাত হানে পাকিস্তানীরা ভাষার প্রশ্নে। মহান ভাষা আন্দোলন, ভাষার জন্য শহীদ হওয়া পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। সেই ভাষা সংস্কৃতির উপর তারা ন্যাক্কারজনক আঘাত হানে।শহীদদের আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে তাদের সেই হীন চক্রান্ত নসাৎ হয়।

চলচিচত্র সংস্কৃতির একটি গুরত্বপূর্ণ অংশ বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। সমাজের সমস্যা অসঙ্গতি তুলে ধরার অন্যতম শক্তিশালী গণমাধ্যম। সেটি ও এখানে তার ভূমিকা রাখতে তেমন সফলতার পরিচয় দেয়নি। রেডিও, টিভি কখনই নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে নাই।

সামাজিক অবস্থা- এক কথায় সমাজ হচ্ছে সংঘবদ্ধ মানুষের সংগঠন। যার অধীনে কিছু মানুষ নিয়ম-কানুন মেনে চলে সুন্দর নিরাপদ জীবন যাপন করে পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে। আর সমাজকে সুন্দর ভাবে পরিচালনার জন্য গড়ে উঠেছে নানা সামাজিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আমরা সেই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে কি দেখতে পেয়েছি? কয়েকটি সংস্থা সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

যোগাযোগ- প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল যানবাহন নিয়ে পরিবহন সংস্থা তার যাত্রা শুরু করে পাকিস্তান আমলে। সময়ে এর চাহিদা বেড়ে গেলেও সেই তুলনায় যানবাহনের সংখ্যা বাড়েনি। অপরদিকে রাস্তাঘাটও অনুন্নত। কিন্তু এই অবস্থাকে আরও ভয়াবহ করে পরিবহনের নেতিবাচক রাজনীতি, দূর্নীতি, দায়িত্বহীনতা ইত্যাদি। রনবী তাঁর কার্টুনে তাই তুলে ধরেছেন নিম্নরুপেঃ

Dhaka University Institutional Repository

ট্রাফিক পুলিশকে বাস ড্রাইভার বলছে- " ... জ্বী হ.... আমার বাসটা বৃটিশ আমলেরই। অ্যাকসিডেন্ট কইরা খালে বিলে না পড়া পর্যন্ত চালাইয়া যামু আর কি..... ।"

এই যদি হয় পরিবহন কর্তৃপক্ষের মানসিকতা তবে পরিবহন খাতের উন্নতি কখনই সম্ভব নয়। পাকিস্তান আমলে পরিবহন এর অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। পাশাপাশি নিরাপত্তাহীনতার ব্যাপারটিও জড়িত ছিল। প্রায়ই ডাকাতি হতো। এ বিষয়টি রনবী তাঁর কার্টুনে চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন-

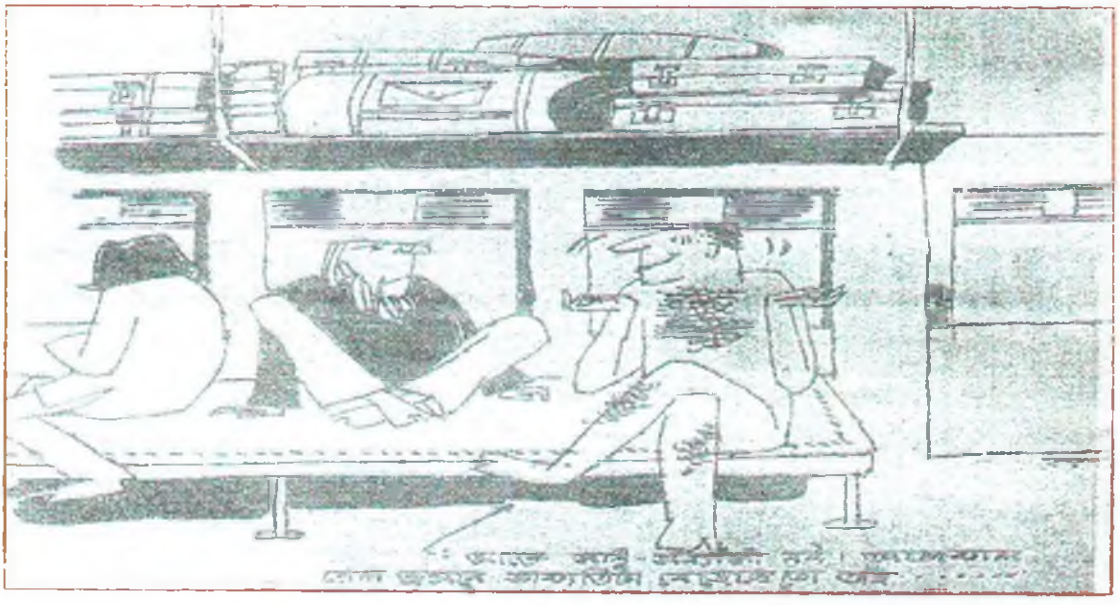

ট্রেনের একটি কামরায় বসা একজন যাত্রী অপর একজন নগ্ন যাত্রী সম্পর্কে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিলে উক্ত উলঙ্গ যাত্রী বলেন- : "আজ্ঞে সাধু সন্ন্যাসী নই। আজকাল রেল ভ্রমনে ডাকাতিটা বেড়েছে তো তাই....."

চমৎকার ভাবে রনবী রেল ভ্রমনে নিরাপত্তাহীনতা সম্পর্কে উপরোক্ত কার্টুনটিতে বর্ননা করেছেন।

স্বাস্থ্য- স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অন্যতম সেবা প্রতিষ্ঠান। অথচ এ সম্পর্কে যথেষ্ঠ উদাসীন থেকেছে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী। জরাজীর্ণ হাসপাতাল, ডাক্তারদের কর্তব্যে অবহেলা, প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের অপ্রতুলতা রোগীর তুলনায় ডাক্তারের স্বল্পতা সব মিলিয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থায় এক তথৈবচ অবস্থা বিরাজমান ছিল। অথচ মানুষের জীবন মৃত্যু প্রশ্ন জড়িত এমন একটি বিষয়ে বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা কথামালা ছাড়া কার্যত তেমন কিছুই হয়নি। গরীব মানুষ স্বাস্থ্যসেবাথেকে হতো

Dhaka University Institutional Repository

বঞ্চিত। হাসপাতালগুলো কোন আমলেই স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। ফলে প্রাইভেট চিকিৎসালয় গড়ে উঠেছে যত্রতত্র। এসব চিকিৎসাকেন্দ্রে উচ্চবিত্তরাই কেবল চিকিৎসা পেত অর্থের বিনিময়ে। আবার এগুলোও যথাযথ নিয়ম-কানুন মেনে চলেনি কখনই। সরকারী হাসপাতালের একটি করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে একটি কার্টুনের মাধ্যমে--

"হাসপাতালের বেডে দুটি কঙ্কাল পাশাপাশি শায়িত অবস্থায় আছে। পরিদর্শকের মনে প্রশ্নের উদ্রেক হওয়ায় কর্তব্যরত ডাক্তার বলছেন-"না এটা এনাটমির ক্লাস নয়, ঔষধপত্রের অভাবেই-----" অর্থাৎ রোগী হাসপাতালে এসে প্রয়োজনীয় ঔষধের ও পথ্যের অভাবে কঙ্কালসার অবস্থায় মারা যায়। খুব কম রোগীই যথাযথভাবে সুস্থ হয়ে ফিরে যেতে পারে। সার্বিক অবস্থা খুবই করুণ। যদিও একটি স্বাস্থ্যনীতি আছে কিন্তু কার্যতঃ তা মানা হয় না বললেই চলে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রোগ নিরাময়ের একটি আবশ্যিক পূর্বশর্ত। নোংরা দূর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ রোগীর জীবন আরো সংকটাপন্ন করে তোলে। পৃথিবীর সব দেশে হাসপাতালগুলিকে তাই পরিষ্কার রাখার উপর জোর দেয়া

Dhaka University Institutional Repository

হয় বেশী। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বাংলাদেশের বৃহত্তম হাসপাতাল। এর ভিতরে যে কোন ওয়ার্ডে গেলে যে দৃশ্য দেখা যায় তাকে কোন অবস্থাতেই আদর্শ বলার উপায় নাই। নোংরা চাদর বালিশ ইত্যাদি অপরিচ্ছন্ন ও শতছিন্ন। ওয়ার্ডের ভিতরেই নোংরা বালিশ, চাদর, তোষক ও ঔষধের কৌটা ইত্যাদির স্তুপ। রোগীদের জন্য সরবরাহ করা খাবারকে কোন ভাবেই স্বাস্থ্যসম্মত ও রুচি সম্পন্ন বলা যায় না, জরুরী বিভাগের অবস্থা দেখে আঁৎকে উঠতে হয়। সর্বত্র অব্যবস্থার ছাপ ও অস্বাস্থকর পরিবেশ। জরুরী বিভাগের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে প্রয়োজনে ভর্তি করার মত ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ড বয় ও আয়া সবর্ত্র মোটামুটি আছে। নাই শুধু এদের সময়মত উপস্থিতি। ঢাকা মেডিকেল কলেজের এ চিত্র থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য সরকারী হাসপাতালগুলির অবস্থা বুঝা যায়। এ অবস্থার ফলে রোগীরা কি দূর্ভোগের শিকার হয় তা সহজেই অনুমেয়।

সমাজের সকল ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অবনতির অবশ্যসম্ভাবী ফল হিসাবে যুব সমাজের মাঝে দেখা দেয় হতাশা। তরুণ সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বেকার থাকে বৈষম্যের শিকার হয়ে।

বেকারত্ব নিয়ে বহু কার্টুনের মধ্যে রনবীর একটি কার্টুনঃ-

Dhaka University Institutional Repository

ইন্টারভিউ দিতে এসে একজন চাকুরীপ্রার্থী তাবু টানিয়েছে। পথচারীর সেদিক দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে সে বলে" চাকরীর ইন্টারভিউ দিতে কতদিন থাকতে হবে ঠিক নেই তো ?.....তাই"।

অর্থাৎ যত ইন্টারভিউতেই যাওয়া হোক না কেন চাকুরী নামের সোনায় হরিনটি বড়ই আরাধ্য, বহু কাঙ্খিত বস্তু।

সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দূর্নীতি তখন ছড়িয়ে পড়েছে। ঘুষ ছাড়া কোন কাজই সম্ভব হয়নি। ঘুষ নামক কালো ব্যধি সমাজের সকল শুভ কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটায়। ঘুষ দূর্নীতির কারণে সব প্রতিষ্ঠানই কম বেশী তার স্বাভাবিক সেবা প্রদানে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। দূর্নীতিপরায়ণ ঘুষখোরের কাছে দেশ-প্রেম বলে কিছু নেই।

নিচের কার্টুনটি থেকে বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যায়-

স্বামী-স্ত্রীকে বেশ খুশী মনে বলছে-"দেশ স্বাধীন হলেও আমাদের লাভই হবে গিন্নী। স্বাধীন ভাবে ঘুষটা নেয়া যাবে...।"

এইসব দূর্নীতিপরায়ণ লোকজন কতটা দেশদ্রোহী হলে এরকম উদাসীন এবং অনৈতিক কথা বলতে পারে তা চিন্তাও করা যায় না। যখন সারা বাংলার লাখ লাখ মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তখনও এরা স্বাধীনতার প্রশ্নে দূর্নীতিকে তাদের ঘুষ গ্রহণ থেকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ায় পর এরাই দূর্নীতির মাধ্যমে রাতারাতি বড়লোক হয়।

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হচেছ শক্তি সম্পদের স্বনির্ভরতা এবং সুসমন্বয়। দুঃখের বিষয় এই অঞ্চল কখনও বিদ্যুৎ, কয়লা বা অন্য কোন শক্তি সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল না। একমাত্র জ্বালানী গ্যাস ছাড়া। যে কোন শিল্প-কারখানায় বিদ্যুৎ অপরিহার্য অথচ বিদ্যুৎ খাতে যে দৈন্য দশা এই অঞ্চলে তা বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন দেশেই নেই। মারাত্মক লোড শেডিং সে আমলে ছিল। আর এর কর্মচারী, কর্মকর্তাদের দূর্নীতি যেন নতুন মাত্রা যোগ করে। ভূতুরে বিল তো আছেই, সেই সাথে লাইন কেটে দেয়া, লোডশেডিং ,দূর্নীতি সব মিলে বিদ্যুৎ খাত সম্ভবত সবচেয়ে জটিল সংস্থা হিসাবে প্রমাণিত। এ বিষয়- এর উপর রনবীর একটি কার্টুন-

কার্টুনটিতে দেখা যাচেছ বিদ্যুৎ-এর বিল হাতে ধরা অবস্থায় একজন লোক দরজায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। এরই প্রেক্ষিতে ভদ্রলোকের স্ত্রী প্রতিবেশী মহিলাকে বলছেন,

"....এক যুগের বিল একবারে আসার সাথে সাথে উনি এরকমটা হয়ে গেলেন...."

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ বিদ্যুৎ বিল তৈরীতেও কর্মচারীদের গাফিলতি ও সময়মতো বিল না দেয়া, সব মিলিয়ে বিদ্যুৎ প্রতি বছর মোটা অংকের টাকা লোকসান গুণতো। এখন শুধু এর পরিমাণটা কয়েকগুন বেড়েছে।

রাজনীতি- দেশ ও জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করাই হচেছ রাজনীতি। অন্যভাবে বলা যায়, রাজনীতি হচেছ অর্থনীতির ঘনীভূত বহিঃপ্রকাশ। পৃথিবীর ইতিহাসে খুব সম্ভবত পাকিস্তানের মতো নৃশংস রাজনীতির দেশ দ্বিতীয়টি নেই। '৪৭ সালে দেশ ভাগের পর থেকেই সেই যে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হলো আজও তার উত্তরাধিকার হিসাবে নেতিবাচক রাজনীতিই চালু আছে বাংলাদেশে।

ধর্মের নামে ভন্ড রাজনীতি শুরু হয়। রাজনীতিবিদদের নীতিবিবর্জিত কর্মকান্ডে অচিরেই জনগণের মাঝে সন্দেহ দেখা দেয়। পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার একদশক পরেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায় এবং সামরিক স্বৈর শাসক ক্ষমতা দখল করে। সামরিক স্বৈরশাসকদের ক্ষমতায় আরোহণ শুরু হয় তার ধারা আজও পাকিস্তানে অব্যাহত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশেও একধিক বার সামরিক সরকার ক্ষমতায় এসেছে। গণতান্ত্রিক রাজনীতি সম্পর্কে ধারণার অনুপস্থিতি, চর্চার অভাবে এখানে সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংগঠনের অভাব ছিল। ব্যাঙের ছাতার মতো অনেক রাজনৈতিক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বেশীর ভাগই প্যাড সর্বস্ব 'One man party'।

অপরদিকে প্রতিক্রিয়াশীলতার অন্যতম চারণভূমি এই অঞ্চল। রাজনীতিতে স্বচ্ছতা বলে কিছু ছিল না এখানে। বিশ্বাস ভঙ্গ, কুচক্র, ধর্মান্ধতা এখানে রাজনীতির উপজীব্য বিষয়। ভোটাধিকার, মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার ইত্যাদি এখানে অনুপস্থিত ছিল। রাজনৈতিক আদর্শ দর্শণ বলে রাজনীতিতে কিছু ছিল না।

যে কোন ধরনের রাজনৈতিক দলের লক্ষ্যই ছিল ক্ষমতা দখল। ক্ষমতা দখলের পর নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলটি কোন শ্রেনীর স্বার্থ রক্ষা করবে সেটা নির্ভর করতো সেই দলটি কোন শ্রেনীকে প্রতিনিধিত্ব করে তার উপর। যে রাজনৈতিক দলগুলি তৎকালীন রাজনৈতিক অঙ্গন মাতিয়ে রেখেছিল তার প্রায় সব কটি উৎপাদনের মূল শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন পরাশ্রয়ী শ্রেনীর সমন্বয়ে গঠিত ছিল। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে এদের রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা দখলের পথ নিত্য নতুন পরিবর্তিত হতো। সেই পথে রাজনৈতিক দলগুলি ব্যাপক জনগণকে শামিল করতে পারেনি বলে সাধারণ মানুষ এসব বিষয়ে উদাসীন ছিল।

এ বিষয়টি একটি কার্টুনের মাধ্যমে বোঝা যায়। এই কার্টুনটিতে আমরা দেখতে পাই যে, এক দম্পতি আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষ্যে তাদের পছন্দের নির্বাচনী দল ঠিক করছে। এক পর্যায়ে স্বামী স্ত্রীকে বলছে, "..এসো লটারী করে দেখি তুমি কাকে ভোট দেবে আর আমি কাকে...."।

নির্বাচনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সময় একজন নাগরিকের যখন উচিত তার শিক্ষা এবং সৎ বুদ্ধির সাহায্যে যোগ্যতম দলটিকে খুঁজে নেয়া, ঠিক তখন একজন শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত নাগরিক লটারির মতো একটি খেলো বিষয়ের মাধ্যমে স্থির করছে সে কোন প্রার্থীকে ভোট দেবে।

উক্ত কার্টুন দেখে আমাদের সামনে পরিষ্কার ফুটে উঠে তৎকালীন নাগরিকের রাজনৈতিক অসচেতনতা ও উদাসীনতার চিত্র। যেখানে একজন শিক্ষিত মানুষের মন-মানসিকতাই এরকম তখন একজন অশিক্ষিত নিরক্ষর মানুষের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে তৎকালীন সময়ে এমন একটি রাজনৈতিক দলও খুঁজে পাওয়া যেত না যার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে তাকে ভোট দেয়া যায়। ফলে সৃষ্টি হতো হতাশা, আর হতাশা পূর্ণতা পেয়েছিল উদাসীনতায়।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে। জন্মের পরেই আসলো ভাষার উপর আঘাত। সৃষ্টি হলো ১৯৫২ সালে মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারী। এলো '৫৪ এর নির্বাচন যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতা গ্রহণ। '৫৮ সালে আইয়ুব শাহীর ক্ষমতা আরোহণ-মৌলিক গণতন্ত্রের নামে ভাওতাবাজি, '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-এর ৬ দফা, '৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, অবশেষে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম, অতঃপর স্বাধীনতা। এই চব্বিশ বৎসরের নানা ঘটনা-আন্দোলন সংগ্রামই বলে পাকিস্তানী রাজনীতির ধরণ কি ছিল । এক জঘন্য রাজনীতি ছিল ঐ সময় ক্ষমতায় থাকার জন্য এবং পাকাপোক্ত করার জন্য এমন কোন অপকর্ম ছিল না যা পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ করেনি। '৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পশ্চিমারা ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। আঞ্চলিকতার উর্দ্ধে উঠতে পরেনি। উত্তরাধিকারের রাজনীতি এখানে প্রবল নোংরা রাজনীতি, দলবাজি, আদর্শহীন রাজনীতি ইত্যাদি সব কিছুই রনবী তাঁর কার্টুনে চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন- একটি কার্টুন-

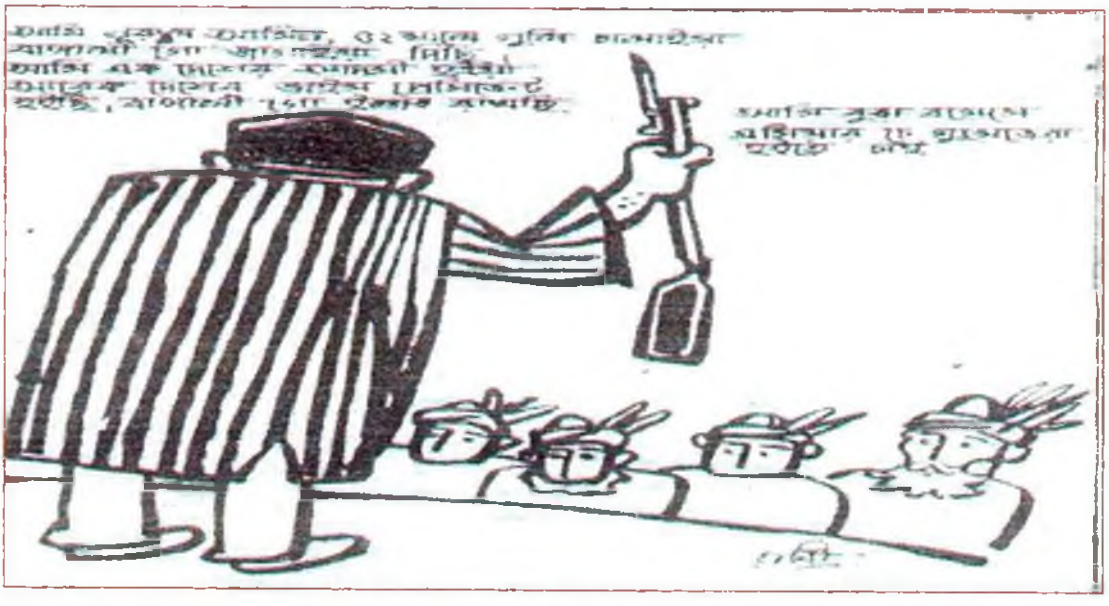

নুরুল আমিন জনসমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন- " আমি নুরুল আমিন, '৫২ সালে গুলি চালাইয়া বাঙ্গালী গো জাগাইয়া দিছি। আমি একদেশের আদমী হইয়া আরেক দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট হইছি। বাঙ্গালী গো ইজ্জত রাখছি",

"আমি বুড়া বয়েসে এসিয়ার চে গুয়েভারা হইতে চাই"

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তাবোধ বিবর্জিত, আদর্শহীন ক্ষমতালিপ্সু, তোষামোদকারী ও চাটুকাররা অবৈধ ক্ষমতা পেয়ে আত্মতুষ্টি লাভ করে রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যে অধঃপতন ডেকে আনতে পারে তার প্রমাণ এই কার্টুনটি।

সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী হিসাবে এ অঞ্চলের সরকার সব সময়ই দ্বৈত ভূমিকা পালন করেছে। কারণ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে সরকারগুলো তাদের শাসন শোষণকে টিকিয়ে রাখতে বিশ্বের নোড়লদের সহযোগিতা ছিল তাদের অপরিহার্য। ফলে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ চরিতার্থেই তাদের মনোযোগ ছিল বেশী। জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে তাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। বরং নিজেদের ক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য ধর্মীয় অনুভূতির বা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আশ্রয় নিত। সার্বিক ভাবে বলা যায় পাকিস্তান আমলের জাতীয় রাজনীতির চরিত্রহীনতা জনজীবনের মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে যা বাংলাদেশ আমলে শুধুই বেড়েছে।

স্বাধীনতা পূর্বকালের অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ননা করা মোটেও সহজ কাজ নয়। চব্বিশ বছর ধরে নিরন্তর যা ঘটে গেছে তা কোন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ছিল না সব কিছুই ছিল আরোপিত। আর এই বৈষম্যমূলক অবস্থা বর্ণনা করা আরও কঠিন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর এত বেশী বৈচিত্রতা এখানে যে দেশের স্বার্থও তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। দলীয় সংকীর্ণতা, আঞ্চলিকতা পরিহার করে এখানকার রাজনীতি কল্যাণমুখী রাজনীতিতে রূপ নিতে পারেনি কখনও। সবচাইতে বড় বিষয় যেটি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামে একটি দেশ স্বাধীন হলো যার দুটি অংশ- পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস দেশ স্বাধীনের অল্প কিছুদিন পরেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ভাবতে বাধ্য হলো যে তারা শোষিত বঞ্চিত হচ্ছে, তারা স্বাধীন নয়। এর প্রভাব পড়ে সমাজের সর্বস্তরে।

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা কার্টুনের মাধ্যমে তুলে ধরা সত্যিই কঠিন কাজ। রনধী সেই কাজটি অত্যন্ত সহজেই সকলের বোধগম্য করে সর্ব বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তোলেন।

Dhaka University Institutional Repository

কার্টুনে প্রতিফলিত সমাজ ও অর্থনৈতিক চিত্র

(স্বাধীনতাত্তোর দশক)

একটি পরাধীন দেশ ও স্বাধীন দেশের আশা-আকাঙ্খা ও কর্মপন্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাকিস্তানী শাসকদের শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতনের প্রতিবাদে সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্যদিয়ে ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। যে আশা-উদ্দীপনা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল তা অচিরেই হতাশাগ্রস্ত হয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রেই স্থবিরতা লক্ষ্য করা যায়। এই অসংগতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহলের কৃতি ব্যক্তিগণ তাদের কাজের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচেছন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কার্টুনিস্ট রনবী। তিনি তাঁর ক্ষুরধার মেধা, প্রজ্ঞা দিয়ে স্বাধীনতা উত্তর কালের সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন বৈষম্য তুলে ধরেছেন তাঁর কার্টুনের মাধ্যমে।

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস, রাজনীতিতে মাস্তান লালন, চুরি-ডাকাতি, হাইজ্যাক, জোর খাটানো, রাহাজানি, চাঁদাবাজি, ঘুষ-দূর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, হত্যা, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার, কালো টাকা ও পেশী-শক্তির বিস্তার, দলীয়করণ, বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত, নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, অবৈধ সম্পদ আহরণ, সম্পদ পাচার, অনাচার-অবিচার অত্যাচার, অস্থিরতা, অবিশ্বাস, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অভাব-অনটন, বেকারত্ব, অপসংস্কৃতি, ধর্মীয় কুসংস্কার, মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি নানাবিধ জটিল সমস্যায় সমাজ আক্রান্ত।

রাজনৈতিক ও ভৌগলিক কারণও অনেক সময় এসব সমস্যার উত্তরাধিকারীত্ব বহন করছে। জাতীয় চেতনা জাগ্রত না হওয়ার জন্য রাজনৈতিক কৌশল কাজ করছে। আধুনিক বিশ্ব যখন শিক্ষা-প্রযুক্তি শ্রম মেধায় গড়ে উঠছে, আমরা তখন অশিক্ষা-কুশিক্ষা, পুরাতন মূল্যবোধ, ধর্মীয় কুসংস্কারকে নিয়ে আছি। সমাজ এগিয়ে চলছে কিন্তু আমাদের সমাজে পশ্চাৎপদতা সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষ ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টিগত ভাবে কলহে মগ্ন। দেশের প্রতি মানুষের আস্থা দরদ, মমত্ববোধ কম। এদেশের মানুষ

Dhaka University Institutional Repository

পরমুখী। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, মধ্যপ্রাচ্য এদেশের প্রতীক। শুধু লুটপাট নয়, নিরাপত্তার জন্য সম্পদ পাচার হয়ে যায়। টেলিভিশনে দেশের মানুষের সুখ-দুঃখের কথা বলার বদলে ক্ষমতাধরদের চেহারা বার বার দেখানো হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ কৃষিকে কেন্দ্র করে গঠিত। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে কৃষি অবহেলিত। কৃষিতে পরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল। কারণ এই সেক্টরের ওপর আর্থ-সামাজিক অবস্থার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ক্ষেত্রটি চরমভাবে অবহেলিত। বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষক কম হলেও ষাট ভাগ। জমির মালিক যারা তারাও অন্য ব্যবসায়ে জীবনের পথ খুঁজে; গ্রামীণ সমাজ আর সহজ সরল নয়। উৎপাদন মানেই মূলধন বিনিয়োগ। আইনের শাসন না থাকায় কৃষিভিত্তিক উৎপাদনে যেতে ধনী শ্রেনী দ্বিধাগ্রস্ত, তরিতরকারী, পিঁয়াজ, রসুন, মরিচ, পেঁপে, কলা, ফলমূল, শাক-শব্জি, আদা, হলুদ সব কিছুতেই দেশ সীমান্ত নির্ভর।

বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও প্লাবনের দেশ। প্রাকৃতিক বিপ্রতা গ্রামবাংলার মানুষের নিত্যদিনের সাথী। বাংলার মানুষ সাহসের সাথে এসব প্রাকৃতিক দূর্যোগের মোকাবেলা করে। কিন্তু এসব ব্যাপারে রাষ্ট্রীয়ভাবে যথোপযুক্ত কোন পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে সরকার উদাসীন।

সন্ত্রাস, দূর্নীতি, জবাবদিহিতার অভাব, স্বেচ্ছাচারিতা, নৈতিক অবক্ষয় আমাদের প্রশাসনের বহু গভীরে প্রবেশ করেছে। ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতা, অপপ্রচার, পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস রাজনৈতিক অঙ্গনকে দূষিত করে রেখেছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিরোধের দেয়াল শুধুমাত্র রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার মধ্যে গড়ে ওঠেনি। সেই সমস্ত চিন্তাধারা দূর্নীতি, কালোটাকা ও অগণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকার প্রশাসন অর্থনীতি সংস্কৃতিসহ সমাজ ও রাষ্ট্র বিকাশের সকল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে রয়েছে। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো আদর্শহীনতায় রোগাক্রান্ত।

শুধুমাত্র রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাংলাদেশকে পরনির্ভরশীল করে রেখেছে। এ কারণে দাতা সংস্থাগুলোকে ক্ষেপিয়ে দেশে কোনো সরকারের পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব হয়নি।আর আমাদের এই দূর্বলতার কারণে দাতাসংস্থা ও দেশগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চিন্তার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের সুযোগ পায়। মূলতঃ বিদেশী সাহায্য বা অনুদান এ জাতির সরকারি চেতনার তীক্ষ্ণতা লোপ করে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দেশের সামাজিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের যে চরম অবণতি ঘটেছে সে কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। জনজীবন অতিষ্ট হয়ে গেছে, জাতির এই ঘৃণিত অবক্ষয় দেখে। অফিস-আদালত, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, যানবাহন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সর্বত্রই এর উপস্থিতি লক্ষণীয়। বাংলাদেশে যতগুলো সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে তার মধ্যে সামাজিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের অবনতি শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে এর পরিমাণ তুলনামূলক যথেষ্ঠ কম ছিল। কিন্তু স্বাধীনতাত্তোর কালে এই আর্থ-সামাজিক অবক্ষয় চরমভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অবক্ষয়ের কারনসমূহঃ

দারিদ্র- আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে এবং পরিবারের ভরনপোষণ করতে গিয়ে সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়।

জনসংখ্যার আধিক্য- বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র হলো বাংলাদেশ। মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.২৫ একর। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়েও এ দেশ ততোটা সমৃদ্ধ নয়। তাই সীমিত আয়তন ও সম্পদের উপর অতিরিক্ত লোকের চাপ মানুষের মৌলক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে কর্মসংস্থান ও সুযোগের অভাবে মানুষ বিকল্প রাস্তা হিসেবে অন্ধকার জগতে পা বাড়ায় তথা সমাজ বিরোধী কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করে।

বেকারত্ব ও কর্মসংস্থানের অভাব- বেকার সমস্যায় বাংলাদেশ জর্জরিত। বেকারত্ব গোটা জাতিকে এক মহাসংকটে ফেলে দিয়েছে। দেশে শিল্পায়নের হার অত্যন্ত মন্থর। অন্যদিকে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচেছ। এ ছাড়া কর্মসংস্থান না বাড়ায় বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানগুলো চাকরির নিয়োগের জন্য চমকপ্রদ বিজ্ঞপ্তি দিলে আমাদের শিক্ষিত বেকার তরুণ/তরুণী সোনার হরিণ ধরার জন্য শত শত দরখাস্ত পেশ করে। আসলে এসব সংস্থা বহু পূর্বে তাদের নিজস্ব লোক নিয়োগ দেয়।

সরকারি বিধিমালা পূরণের জন্য এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে দেখানোর জন্য এরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আগের নিয়োগ নিয়মিত করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে তরুণ/তরুণীরা চাকরী না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন গর্হিত কাজ করে। রনবী তাঁর কার্টুনে এই প্রকট

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যা, বেকার সমস্যাকে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে। এখানে একটি কার্টুন উল্লেখ করা হলোঃ

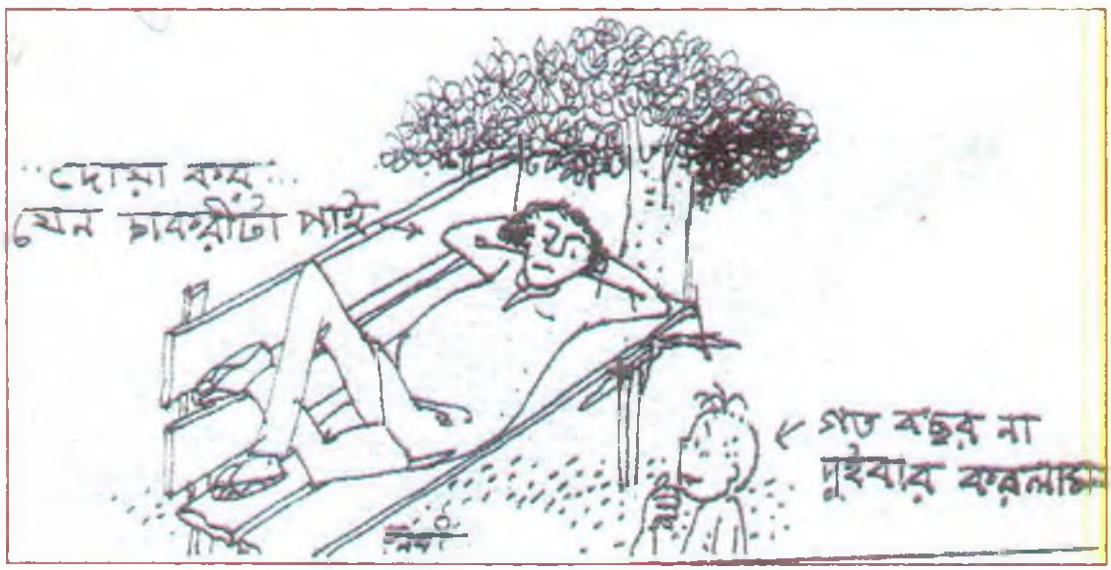

কার্টুনে এক বেকার যুবক উদাসভাবে পার্কের বেঞ্চের উপর শুয়ে টোকাইকে বলেছে- "..দোয়া কর... যেন চাকরীটা পাই"

টোকাই তাৎক্ষনিক জবাব-"গত বছর না দুই বার করলাম"।

অর্থাৎ এই সমাজের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা শেষ করে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকুরীর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু চাকুরী পায় না কেননা শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের আশানুরূপ প্রসার না ঘটায় আমাদের দেশে কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। আর যেটুকু আছে তাতেও সুযোগ সেসব ছেলে মেয়ে যাদের আছে খুঁটির জোর এবং ঘুষ দেবার মত অবস্থা। ফলে দেশে বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

আমাদের দেশে মাদকাশক্তির পরিমাণ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। মাদক সেবনের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তি ছিনতাই, রাহাজানি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে সমাজকে কলুষিত করে ফেলেছে।

রাজনৈতিক কারণ- স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশের রাজনীতিতে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। রাজনীতি ক্রমান্বয়ে পেশীশক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে। রনবীর বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্টুনের মধ্য থেকে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে করা একটি কার্টুন নিম্নে আলোচিত হলো।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৯ সালের এই কার্টুনটিতে একটি বাচচা ছেলে টোকাইকে বলছে যে তার অনেক আত্মীয় স্বজন সংসদে আছে। উত্তরে টোকাই বলছে "যাগো আছে তায়াই আবার এককালে সংসদে জায়গা পাইয়া যাইবো"। অর্থাৎ টোকাই বলতে চাচেছ, বাচচা ছেলেটির একদিন হয়তো সংসদে যেতে পারবে যেহেতু তার প্রচুর আত্মীয় স্বজন সংসদে আছে। আমাদের দেশে এটি আজ প্রায় প্রথাগত হয়ে পড়েছে। আর তা হচেছ রাজনৈতিক উত্তরসূরীতা। যেমন আমরা আমাদের দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অনেক সদস্যই এমন যে তাদের পূর্বপুরুষ বা আত্মীয় স্বজনেরা রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন। "সঠিক রাজনৈতিক বোধ থাক বা না থাক যেহেতু আমার আত্মীয় স্বজনেরা রাজনীতিবিদ আমাকেও তাই হতে হবে"- এটাই যেন হয়ে উঠেছে নব্য রাজনীতিবিদদের মূল মন্ত্র। কিন্তু এতে লাভের বদলে ক্ষতিই হচেছ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারণ একজন আদর্শ রাজনীতিবিদের আত্মীয়ও যে তাই হবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং পূর্বসূরীদের ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে উত্তরসূরীগণ বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন যাতে করে দেশের বিভিন্ন ক্ষতি হবার পাশাপাশি জনগণের কাছে রাজনীতিবিদদের ভাবমূর্তিও ক্ষুন্ন হচেছ।

শিক্ষায় অভাব- আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণ শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত। অর্থনৈতিক উন্নয়নে অশিক্ষিত ও অজ্ঞ জনগণের কোন ভূমিকা ছিল না বা থাকেও না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হয়, তার মাত্র ৪৬ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে। মাধ্যমিক স্তরে নিবন্ধের হার ১৯ শতাংশ। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রতি ৬৩ জন ছাত্রের জন্য ছিল একজন শিক্ষক।

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। দুঃখের বিষয় হলো বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। শিক্ষাকে জাতির মেরুদন্ড বলা হয়ে থাকে। কিন্তু গ্রাম ও বস্তিগুলোর অসহায় শিশুর শিক্ষার যে অব্যবস্থা তা পীড়াদায়ক। শিক্ষা সবার জন্মগত অধিকার। কিন্তু এলাকার জনপ্রতিনিধি, সমাজসেবী, সরকারী প্রশাসক ও রাজনীতিবিদরা শিক্ষার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে জোরদার করতে তেমন প্রয়াসী হননি।

এদেশের প্রচুর মানুষ শিক্ষাহীন অবস্থায় আছে। কেউ কেউ লেখাপড়া শিখতে পারে না। কেউ কিছুদূর পড়াশোনা করে আর করতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে না। '৭০ এর দশকের রনবীর এই কার্টুনে উপরোক্ত কথাটি বলছে একটু ভিন্ন ভাবে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে। টোকাই উচচবিত্তের একটি ছেলেকে বলছে.--

আমাগো লাইগ্যা.... বুঝলা...

শিক্ষায় তিন রকমের ব্যবস্থা;

আর তোমাগো মোটে --একটা

এক নম্বরঃ আল্লাহর দেওয়া শিক্ষা-"বুইড়া আঙ্গুল"।... কামে আকামে কালি লাগাইয়া টিপসই মারন যায়। পাড়ার বেকার শিক্ষিত পোলাপান "সই" করণ শিখায় - এইটা দুই নম্বর।

তিন হইল... ঘর বেইচা ভাঙ্গা প্রাইমারীর "কেলাশ ফাইভ" ডিগ্রী। আর তোমাগো লাইগ্যা খালি উঁচা শিক্ষা.. ।

করুণ কিন্তু রসবোধসম্পন্ন টোকাইয়ের এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রনবী বোঝাতে চেয়েছেন দরিদ্র শিশুদের উচচ শিক্ষা গ্রহণের বাঁধাকে।

দরিদ্র হবার কারণে একটি শিশুর ইচছা থাকা সত্ত্বেও পড়তে না পারার কষ্ট যে কত বড় কষ্ট তা বুঝতে পারা যায় রনবীর নিম্নের কার্টুনটি থেকে

Dhaka University Institutional Repository

যেটি বিচিত্রায় ছাপা হয়েছিল। এই কার্টুনটিতে স্কুলে যাচ্ছে এমন একটি বালক টোকাইকে বলছে--

"সকালে ঘুম ভাঙলে আমার প্রথমেই স্কুলে যাবার ঝক্কির কথা মনে পড়ে আর মনটা খারাপ হয়ে যায়"। এ প্রসঙ্গে টোকাইর তার মন খারাপের কারণ হিসেবে বলে, ..তোমাগো...
ইসকুলে যাওন দেখতে ঘুমটা ভাঙলো কেন ভাইবা মনটা....। অর্থাৎ এ কার্টুনটিতে দরিদ্র মানুষের শিক্ষা লাভের সুযোগহীনতার কথা এবং এ বিষয়ে তাদের বেদনার কথা বলা হয়েছে।

একটি মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্ত পরিবারের শিশু চিন্তাও করতে পারে না যে একটি দরিদ্র শিশু কি করুণ অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। তাদের ধারণা যে সব শিশুই কম বেশী শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে এ কথাটি ঠিক না।

বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের শিক্ষার দুরবস্থা নিয়ে '৭০ দশকের উপরোক্ত কার্টুনে রনবী দেখিয়েছেন দুটি শিশু স্কুলে যাবার সময়

Dhaka University Institutional Repository

টোকাইকে প্রশ্ন করছে,..স্বাক্ষরতা দিবসে কি করলি?....

উত্তরে ভাবুক টোকাই বলছে, "..আরাম কইরা সারাদিন তোমাগো স্কুল যাওন-আওন দেখলাম....."।

কার্টুনটি আমাদের সামনে একটি নির্মম সত্য প্রকাশ করছে। স্বাক্ষরতা দিবস, কিংবা অন্য যতরকম শিক্ষামূলক কার্যক্রম আছে তার সুবিধা এক শ্রেনীর মানুষ পাচেছ না বা পায় না। তাই এই শ্রেনীর মানুষ কেবল অন্য শ্রেনীর মানুষের উন্নতি দেখেই যাচেছ। যার মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষার উন্নতি।

অসম বন্টন ব্যবস্থা- বাংলাদেশের সম্পদের বন্টন ব্যবস্থা যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। এদেশের মুষ্টিমেয় লোকের কাছে বিশাল সম্পত্তি ও টাকা-পয়সা রয়েছে এবং এর ফলে বিপুল জনগোষ্ঠী সহায় সম্পদহীন। প্রাচুর্যের আধিক্যে লালিত সন্তান সম্পদের অহংকার ও টাকার গরমে যেমন অসামাজিক কার্যকলাপ তথা মদ, গাজা, হেরোইন ও কোকেন সেবন করে। তেমনি অভাব আর তাচ্ছিল্যের মধ্যে বেড়ে উঠা সন্তান সন্ত্রাস, মাস্তানী, চাঁদাবাজি আর রাহাজানিতে সুদক্ষ হয়ে উঠে।

অপসংস্কৃতিঃ অশ্লীল পত্রিকা, চলচিচত্রের দৃষ্টিকটু নাচ-গান, সংলাপ আর অতি নিম্নমানের কাহিনীতে এদেশের যুব সমাজ ক্রমান্বয়ে বিপথগামী হচেছ।

Dhaka University Institutional Repository

যে অপসংস্কৃতি আমাদের সমাজে ভূতের ন্যায় চেপে বসেছে- তার কুফল ইতমধ্যেই অনুমিত হয়েছে।

ভৌগলিক কারণ- প্রাকৃতিক দূর্যোগ, এলাকার প্রভাব, ঋতুর প্রভাব, খাদ্যাভাস ইত্যাদি কারণও মানুষের মধ্যে বিরাট প্রভাব ফেলে এবং এর ফলে মানুষ বিবেক বর্জিত কাজ করে থাকে।

রাজধানী ও নগর পরিক্রমা- ঢাকা শহরে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের অবস্থান এবং এই শহরের প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০ হাজার লোকের বাস। দারিদ্র আর জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের দেশের পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে রাজধানী ঢাকা মহানগরী ক্রমেই বাসযোগ্যতা হারাচেছ, ঢাকার ওপর জনসংখ্যার চাপ বিপদজনক হারে বেড়েছে। অপরিকল্পিতভাবে বস্তি ও হাইরাইজসহ বসতি বেড়েছে। যানবাহন এতো বেড়েছে যে যানজট এবং তারও চেয়ে বেশি সিসাযুক্ত ধোঁয়ায় দূষণমাত্রা ছাড়িয়ে যাচেছ। এ অবস্থা কেবল ঢাকার নয়, অন্যান্য জেলা শহরে একই ভাবে এই সমস্যাগুলি বেড়েছে।

নগরীর আবর্জনা সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণের দূর্বল ব্যবস্থাপনা পরিবেশ দূষিত হওয়ার একটি অন্যতম কারণ। বর্জ্য হলো বিরক্তিকর, অপ্রিয় দূর্গন্ধময়, পরিবেশ দূষণকারী, আপাত-সমাধানহীন একটা অবয়ব। বিভিন্ন অব্যবস্থাপনার দরুণ এই সব বর্জ্য সরিয়ে ফেলা হয় না বলে নগরবাসীকে প্রত্যহ এক অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। এ বিষয়ের উপর রনবীর দুটি কার্টুন নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

রাজধানী ও তার পরিকল্পনার বেহাল অবস্থাকে বুঝানোর জন্য 'দৈনিক বাংলা'য় ১৯৭৮ সালের একটি কার্টুনে রনবী দেখিয়েছেন, দুজন লোক দুটো যত্রতত্র ফেলে রাখা বিশাল ময়লার ঢিপির দিকে তাকিয়ে বলছে যে, নগর পরিকল্পকরা হয়ত রাজধানীতে একটি পাহাড়ী লুক আনার চেষ্টা করছে। পরিকল্পনাহীন ও আবর্জনাময় এই রাজধানী সম্বন্ধে এ ধরনের বিদ্রূপের মাধ্যমে রনবী তুলে ধরেছেন নগর পরিকল্পনাকারীদের উদাসীনতাকে।

অপর কার্টুনটিও 'দৈনিক বাংলা; পত্রিকায় সত্তরের দশকে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ কার্টুনটিতে - দুজন লোকের একজন লোক নাকে রুমাল চেপে বলছেন যে- আবর্জনাময় রাস্তাঘাটের জন্য নিদেনপক্ষে একটি করে রুমাল পৌরসভার দেয়া উচিত। রাজধানীর নগর পরিকল্পনাকারীদের উদাসীনতা, অকর্মণ্যতার জন্য দেশের প্রধান শহরে প্রচুর আবর্জনা ও জঞ্জালের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে রাজধানীর মানুষ এসব আবর্জনার গন্ধে বাইরে বেরোতে পারছেনা নাকে রুমাল চেপে ধরা ছাড়া। তাই রাজধানীর একজন নাগরিকের বলা- নিদেনপক্ষে একটি রুমালের ব্যবস্থা করা কথাটি খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছে। কেননা নগর পরিকল্পনাকারীরা কোন ব্যবস্থা না নেয়ার ফলে এসব দূর্গন্ধ সৃষ্টি হয়েছে এবং এসব জঞ্জাল সরিয়ে নেওয়াও হচেছ না। তাই নাকে চাপার জন্য রুমালের ব্যবস্থাটা করলের বাইরে যাওয়া যায় বলেই হয়ত এ বিদ্রূপের সৃষ্টি।

দূর্নীতি- প্রশাসন ও সরকারের দূর্নীতি বাংলাদেশে একটি বহুল আলোচিত ব্যাপার। সুবিধাবাদী কয়েকটি স্বার্থবাদী রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের ফলে এই দুঃখজনক ব্যাপারটি বেশ খোলামেলা, বৈধ ও প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে। এতে শুরুতে ব্যক্তির এবং পরে রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক স্খলন অনিবার্য বলে শেষ পর্যন্ত ব্যাক্তির যতটা না নৈতিক অধঃপতন ঘটে তারচেয়ে দেশের সাধারণ জনগণ খুব বেশিমাত্রায় মানবতা ও মূল্যবোধ হারিয়ে দুঃখজনক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমাদের দূর্ভাগ্য হলো, সরকারের একেবারে মাথা থেকে শুরু করে বেসরকারী বাস টার্মিনাল পর্যন্ত সবখানে চলে আলাও ঘুষ, দূর্নীতি, চাঁদাবাজি। পুলিশ, কাস্টমস, মন্ত্রীর দপ্তর, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্যাম্পাস, রাজনৈতিক দল, জাতীয় নির্বাচন, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র ও যুব সংগঠন- বলতে গেলে প্রায় সব প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সংগঠন এই অপরাধের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দলগুলো ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র ও যুব ক্যাডারদের ব্যবহার করে। সেই সুবাদে তারা সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি চালিয়ে যায়। পুলিশ সরকার ও সরকারি দলের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। তাই তাদের নানা অনিয়ম ও দূর্নীতির ব্যাপারে সরকার প্রায় ক্ষেত্রে মৌন সম্মতি জানায়। প্রশাসনে দলীয়করণ আমলাদের অসৎ কাজে উৎসাহী হতে সাহসী করে তোলে।

দূর্নীতি নিয়ে রনবীর একটি কার্টুনঃ

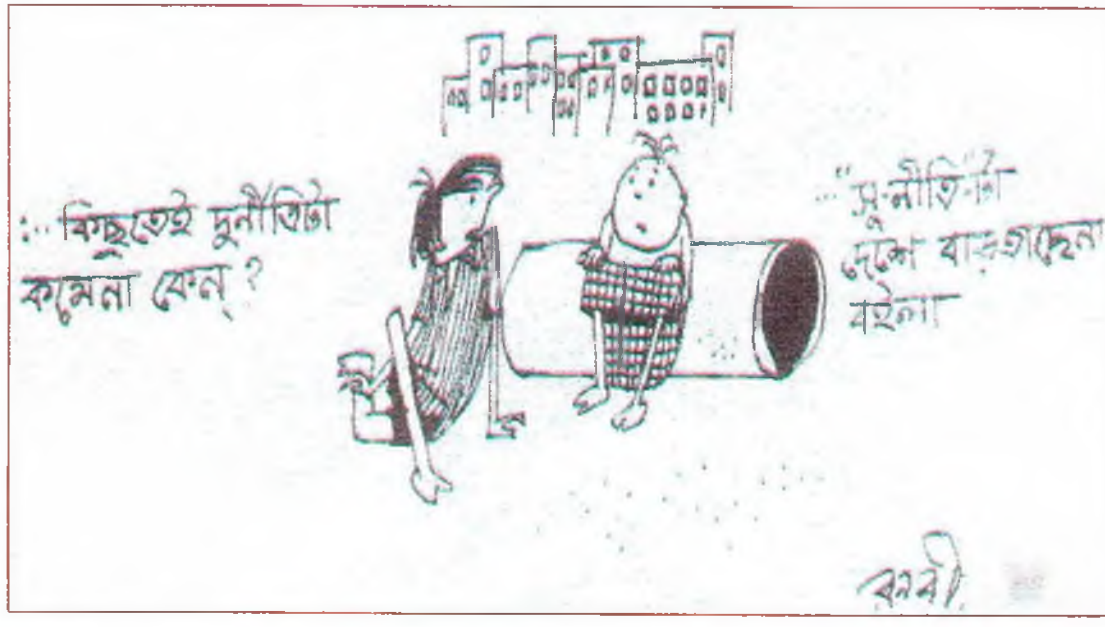

..কিছুতেই দূর্নীতিটা কমে না কেন? এই প্রশ্নের জবাবে টোকাইয়ের উত্তর, ..."সু-নীতিটা দেশে বাড়তাছেনা বইলা।"

এই কার্টুনটি বিচিত্রায় ছাপা হয়েছিল। সত্যিকার অর্থে দেশে নীতি বা সু-নীতির অভাব বলেই দূর্নীতি বাড়ছে, এটিই রনবী বুঝিয়েছেন মাত্র একটি বাক্যের মধ্য দিয়ে।

বাঙালী ধনীক শ্রেনী- বাঙালী ধনীক শ্রেনীর বিকাশ কোন সময়েই বাধাহীন ছিলনা। নিজেদের বিকাশের জন্য তারা সব সময় সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিল। দুইশত বছরের ইংরেজ শাসন ও চব্বিশ বছরের পাকিস্তানী শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে বাংলাদেশের মানুষ একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ইংরেজ আমলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নীতি এই অঞ্চলের জনসাধারণকে ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেনীতে বিভক্ত করে দেয়। সমাজের উচচ পর্যায়ের -মুষ্টিমেয়

Dhaka University Institutional Repository

বিত্তশালী ভূ-স্বামী, স্বৈরাচারী সরকারী কর্মচারী ও দূর্নীতি পরায়ণ ব্যবসায়ী। আর নিম্ন পর্যায়ের -লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত ও দরিদ্র জনসাধারণ। সমাজের ধনীক শ্রেনী যথেষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করে এবং দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ করে নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখে।প্রতিটি ক্ষেত্রে রনবীর কার্টুনের অবাধ পদচারণা এ বিষয়ের একটি কার্টুন। আমাদের বাঙালী সমাজে ধনী মাত্রেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতীক। এই বিষয়টি বের হয়েছে বিচিত্রায় টোকাইয়ের আরেকটি কার্টুন থেকে। যেখানে একজন উচ্চবিত্ত ভদ্রলোক টোকাইকে প্রশ্ন করছে, ..বল দেখি সুখ আর দুঃখের মধ্যে পার্থক্য কি?

টোকাই তার উত্তরে বলে,..আপনার আর আমার মধ্যে যেমন।

মাতৃভাষার মর্যাদা- পরাধীন দেশে রক্তের বিনিময়ে আমরা বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছি। আর স্বাধীনাত্তোর দেশে এ ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা শঙ্কিত। একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের মহান শহীদ দিবস। এ দিনটি আমাদের অতীতকে, আমাদের সার্বিক পরিচয়কে জানিয়ে দেয়। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনে '৫২- এর ভাষা আন্দোলন এক বিশাল ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। এই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পেরেছি, স্বাধীনতা লাভ করেছি, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ভূখন্ডের মালিক হয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ভাষাকে ঘিরে আমাদের এই সফল আন্দোলন, তার সুফল স্বাধীন বাংলাদেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে নি । সম্ভব হয়নি দেশের অধিকাংশ মানুষকে অক্ষর জ্ঞানের আওতায় নিয়ে আসা। পারিনি ভাষাকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত মর্যাদায় আসীন করতে। এটা আমাদের জাতীয় জীবনে চরম ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। '৭০ এর দশকের টোকাইকে নিয়ে রনবীর একটি কার্টুনে দেখা যাচেছ এক ভদ্রলোক টোকাইকে প্রশ্ন করছে একুশে ফেব্রুয়ারী....কি..বলতো?....

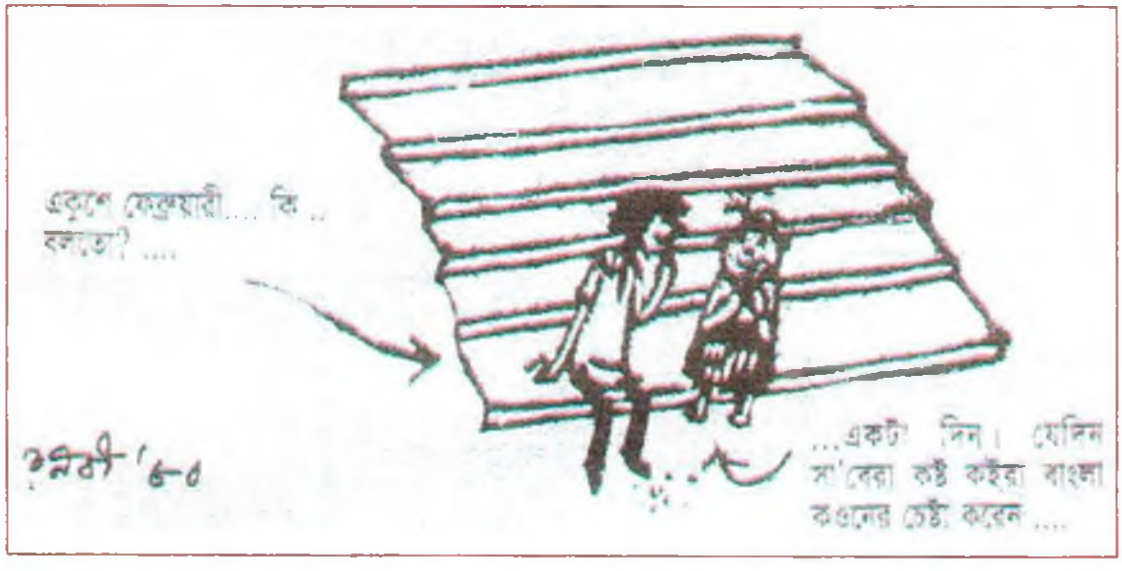

তার উত্তরে টোকাই বলছে-"একটা দিন। যেদিন সা'বেরা কষ্ট কইরা বাংলা কওনের চেষ্টা করেন...."

বর্তমানে আমাদের মাতৃভাষা আন্দোলন দিবস আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের সম্মান লাভ করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সমাজের উঁচু শ্রেনীর লোকেরা যারা টোকাইর কাছে "সাব" বলে পরিচিত তারা এক একুশে ফেব্রুয়ারীর দিন ব্যতীত বাংলা ভাষার মর্যাদা রাখার চেষ্টা করে না। আর এই বদভ্যাসের দরুণ একুশে ফেব্রুয়ারীর দিনও তাদের বাংলা ভাষা বলতে কষ্ট হয়। উপরোল্লিখিত কার্টুনটিতে এটিই বোঝান হয়েছে।

জনসংখ্যার চাপ- দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচচ হার অর্থনৈতিক প্রগতি ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান নীচু হওয়ার প্রধান কারণ।

Dhaka University Institutional Repository

'দৈনিক বাংলা'য় ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত একটি কার্টুনে দেখানো হয়েছে একটি খবর যেখানে বলা হয়েছেঃ

"২শ যাত্রী নিয়ে যমুনায় আবার লঞ্চ ডুবি"। আর চিত্র এঁকে একটি লঞ্চ দেখানো হয়েছে যা ডুবে যাচেছ, তারপাশে পানিতে ডুবন্ত মানুষকে দেখা যাচেছ। যাদের একজন বলছে...যাউক..মইরা বাঁচি, আর কোনদিন দেশের "লঞ্চ-ফঞ্চ"- এ উঠন লাগবোনা....

রনবী উক্ত কার্টুনের মাধ্যমে অত্যন্ত করুণ হাল দেখিয়েছেন আমাদের জনবহুল দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার । বিশেষ করে নৌ পরিবহন ব্যবস্থাকে। একজন মানুষ বেঁচে থাকলে তাকে যাতায়াত করতেই হবে আর এদেশের প্রচুর যাত্রী নিয়ে যেসব লঞ্চ ষ্টীমার ইত্যাদি চলে সেগুলি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং কষ্টদায়ক। তাই এই কার্টুনটিতে ডুবন্ত মানুষের মইরা বাঁচি কথাটির মধ্য দিয়ে রনবী বুঝিয়েছেন বেঁচে থেকে এই জনবহুল কষ্টকর ও ঝুঁকিপূর্ণ নৌ-পরিবহনে চলাচল করার চেয়ে একেবারে মরে গেলেই বেঁচে যাওয়া যায়। কারন এই অবস্থা ছিল, আছে এবং থাকবে।

বস্তি ও কৃত্রিম মানবিকতা- বাংলাদেশে ভূমির তুলনায় মানুষ বেশি। এ কারণে সাধারণ মানুষের নগর নির্ভরতা উল্লেখ করার মতো এবং এরা অবশ্যই

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকামুখী। এভাবে গ্রামত্যাগী শহরমুখো ছিন্নমুল মানুষদের নিয়ে বেড়ে উঠেছে রাজধানী ঢাকা। বছরের পর বছর উন্নয়নের সংকটে দিশেহারা ভাসমান এই জনগোষ্ঠী এবং এদের বিবর্ধমান বস্তি এদেশের বড়ো এক ধরণের বাস্তবতা। তাদের মানবেতর জীবন-যাপন বড়ই কঠিন এবং দুঃখজনক হলেও সত্যি যে এটা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামগ্রিক ভাবে রাজনৈতিক ব্যর্থতার ফসল।

যারা নগর সভ্যতায় বাস করে বিলাসবহুল জীবন যাপন করছে এবং কিছু মানুষের জন্য বস্তির জীবনের মানবেতর জীবন ধারাকে নগর সভ্যতার বাস্তবতা বলে যুক্তি প্রদর্শন করছে; তারা একদিকে যেমন সভ্যতার সামগ্রিকতাকে অস্বীকার করছে, তেমনি মানুষের আত্মসম্মানবোধ, তার যোগ্যতা, মানবিক অধিকার ও সম্ভাবনাকে অস্বীকার করছে। যারা সম্পত্তি দখল, ব্যাংক থেকে বড়ো অঙ্কের গৃহীত ঋণকে আত্মসাৎ করে, কর ফাঁকি দিয়ে অথবা অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে বিশাল অট্টালিকায় বাস করে এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে যাতায়াত করে তারাই যখন কুমিরের অশ্রুপাত করে বস্তিবাসীর জন্য, তখন অন্য যেকোন শোষকের সঙ্গে এদের যে পার্থক্য বড়ো হয়ে ধরা পড়ে তা হলো- ভন্ডামি, বুদ্ধির অসততা ও কৃত্রিম মানবিকতা।

বস্তিবাসীকে মানসিকভাবে পঙ্গু করা হয়েছে নানা শোষণের ও অবমাননার দ্বারা। কিছু লোক এদের দেখিয়ে সরাসরি জায়গা দখল করে আছে। এদের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস চুরি অবৈধ সংযোগ দ্বারা। ছিনতাই, সন্ত্রাস, মোমাবাজি, মাদক ব্যবসার প্রসার ঘটিয়েছে এবং বস্তিবাসীর আড়ালে আশ্রয় নিচেছ। এই শোষণের জাল শুধু স্থানীয়ভাবে বিস্তৃত নয়, এটা একটি আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে।

উচচবিত্ত শোষক শ্রেনীর মানুষ ও মাঝে মাঝে দার্শনিকের মতো কথা-বার্তা বলে যা কিনা তাদের কর্ম ও জীবনপন্থার সাথে মিলে না। টোকাই এরকম একজন দার্শনিকের (!) প্রশ্নের খুব সুন্দর জবাব দিয়েছিল রনবীর নিম্নোক্ত একটি কার্টুনে।

যেখানে একজন "স্যুটেট বুটেট" উচচবিত্ত দার্শনিক ভঙ্গিতে বলছেন টোকাইকে, ..ধর দুনিয়াটা হঠাৎ সুখ শান্তিতে ভরে গেল...কি হবে? এর উত্তরে টোকাই বলছে, ..কাগোটার কথা কইতাছেন? আপনাগোটার...না...আমাগোটার? । উচচবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে অন্য

Dhaka University Institutional Repository

সবকিছুর মত সুখ-শান্তির ক্ষেত্রেও যে একটি গভীর বিভেদ রেখা আছে তার প্রতি কটাক্ষ হেনেছেন রনবী এই কার্টুনটিতে।

সামাজিক বঞ্চনা- সমাজের উঁচু তলার ধনীক শ্রেনীর একটি অন্যতম বিনোদন হচেছ নীচু গরীব শ্রেনীর লোকদের নিয়ে ভাবা। কিন্তু তাদের সাহায্য সহযোগিতা না করা। নিম্নবিত্ত শ্রেনীর কেউ যদি উঁচু শ্রেনীতে যায় তাহলে তারাও এই কাজটি করে।

এর উপর ভিত্তি করে রনবীর টোকাইকে নিয়ে একটি কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল বিচিত্রায় সত্তরের দশকে। যেখানে একজন উচচবিত্ত আয়েশী ভঙ্গিতে বসে টোকাই তথা নিম্নবিত্তের একজন প্রতিনিধিকে জিজ্ঞেস করছে,

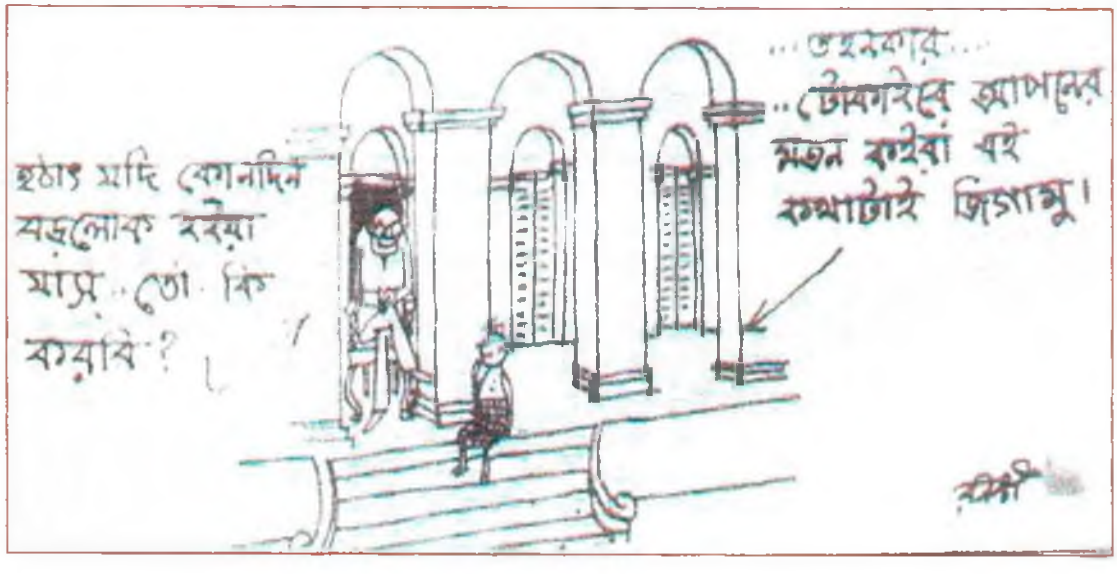

Dhaka University Institutional Repository

হঠাৎ যদি কোনদিন বড়লোক হইয়া যাস তো কি করবি? এর উত্তরে জুৎসই একটা জবাব দিয়েছে টোকাই, তার উত্তর, তখনকার.... টোকাইরে আপনের মতন কইয়া এই কথাটাই জিগামু। অর্থাৎ বড়লোক হলে টোকাইও উচচবিত্তের মতো মনমানসিকতা সম্পন্ন হয়ে পড়বে।

ঋণখেলাপি- স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে কৃষকেরা উৎপাদনের দিক থেকে শিল্প উদ্যোক্তাদের চেয়ে এগিয়ে ছিল। যদিও তাদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার মানসে কোনো ভূমিকর ধার্য করা হয়নি, তথাপি সমাজের এই দূর্বল দিকটিকে পুঁজি করে ক্ষমতালোভী ও মুনাফালোভী সম্প্রদায় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সে ঋণ শোধ করে না। ব্যবসায়ীরা সরকারের দূর্বলতা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার শিরা ধরতে অতিশয় পারঙ্গম এবং বলাই বাহুল্য, তারা ভালো করেই জানেন যে, নতুন নতুন বিদেশী অনুদান ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পরিবর্তন সূচিত করবে এবং তাদের ঋণ সরকার মওকুফ করে দিবে। এরকম অব্যবস্থা এবং প্রায় বিনাকষ্টে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসা সরকার-এর এ ধরণের সহজলভ্য ক্ষমা ও কর বসানোর অনীহার ফলে দেশের অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠী পুরোমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি- নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেশী হওয়ায় ফলে তা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে ছিল। এতে এক শ্রেনীর মানুষের কোন সমস্যা না হলেও সাধারণ মানুষের দূর্ভোগের শেষ ছিল না। এ বিষয়ের উপর রনবীর অসংখ্য কার্টুনের মধ্যে কয়েকটি কার্টুন বিশ্লেষিত হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৯ সালে 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কার্টুনে এক বিড়াল অন্য একটি বিড়ালকে বলছে "..... হ্যাঁর .... মাছ - মাংসের দাম বেশী বলে সবাই যে খাওয়াই প্রায় ছেড়ে দিচ্ছে!! কাঁটা-কুটিটাও না পেলে আমাদের কি হবে?

উক্ত কার্টুনে রনবী বিড়ালদের কাঁটা-কুটি প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নিয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের মাছ-মাংসের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাসের ব্যাপারটিকে।

সত্তর এর দশকের অপর একটি কার্টুনে একটি খবরে লেখা আছে, ঢাকার বাজারে চালের দাম কমেছে; মাছের দাম কমেনি। এ খবরের প্রেক্ষিতে কার্টুনটিতে - এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলেছেন, ... কমলেই যে আবার সবাই'মাছে-ভাতে বাঙ্গালী হয়ে যাবে গো।

উপরোক্ত কথা দিয়ে রনবী বোঝাতে চেয়েছেন ঢাকার বাজার তথা আমাদের দেশের বাজারগুলোতে একটি দ্রব্যের দাম যদি কমে, অপর দ্রব্য সামগ্রীগুলোর দাম একই রকম আকাশছোঁয়া থাকে অথবা বেড়ে যায়। অর্থাৎ দেশের মানুষের ব্যয়ভার কমে না একই রকম থাকে।

যখন বাজারে সবকিছুর দাম বেড়ে যায় তখন সেই সাথে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রীর দামও বেড়ে যায়। এমনকি পরিবহন ব্যবস্থার উপরও এর প্রভাব পড়ে। বাস, বেবী, টেম্পু, গাড়ী এমনকি রিক্সার ভাড়াও বেড়ে যায়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত রনবীর একটি কার্টুনে এই ব্যাপারটি বোঝা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

কার্টুনটিতে দেখা যায় রিকশার ভাড়া শুনে হতভম্ব এক যাত্রীকে রিকশাওয়ালা বলছে "আর কয়দিন বাদে তো প্যাডেল প্রতি পয়সা চামু সাব ..... তখন কি করবেন?" অর্থাৎ এই রিকশাভাড়া শুনে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রিকশাভাড়া আরো বাড়বে। বাজারে সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ে। ফলে সাধারণ জনগণের হয় সমস্যা। কারণ খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়লে কি হবে পেটে তো দিতে হবে। এই ব্যাপারটি রনবী কার্টুনে দেখিয়েছেন একটি কার্টুনে এভাবে----

এক লোক বেশী দাম দিয়ে পেঁয়াজ কিনে তাঁর স্ত্রীর কাছে সাফাই গাচ্ছেন, ".....আবার ঘুরে ফিরে পেঁয়াজের পাল্লায় পড়ে গেলাম গিন্নী। আট টাকা ছাড়া ব্যাগে ঢুকতে চায় না..."

ভাঙাচোরা সড়ক- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শহরের ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে চলাচল করাটাই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। সড়কের বিভিন্ন স্থানে পিচ ও ইটের খোয়া উঠে গিয়ে বড় বড় গর্ত সৃষ্টির ফলে বৃষ্টির দিনে সড়কের উপর হাটু পানি জমে পথচারীদের বিড়ম্বনায় পড়তে হতো।

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়ের উপর রনবীর একটি কার্টুনে দেখা যায়

একটি গাড়ীতে দুজন লোক বসে আছে। এদের মধ্যে ড্রাইভিং সিটে বসা জন ডুবুরীর পোষাক পরিহিত। এবং তিনি তাঁর পোষাকের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এই বলে যে , "বৃষ্টি হলেই..... পথে গাড়ি ডুবে যায়তো..... তাই ডুবুরীর 'মাস্ক' নিয়ে বেরিয়েছি....."। ঠাট্টা ও বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে তিনি সামান্য বৃষ্টিতে ডুবে যাওয়া বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের পথ-ঘাটের চিত্রকে বুঝিয়েছেন।

যুবসমাজ- দেশের প্রায় সত্তর ভাগ লেখাপড়া না জানা যুবকের অনাহারে অর্ধাহারে, অপুষ্টিতে গড়ে উঠা শরীর। এরা মৃত নয় আবার জীবিতও নয়। মধ্যবিত্ত উচচবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়েরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখেও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় তারা হতাশাগ্রস্ত। চাকুরীর নিশ্চয়তা নেই। যাদের খুঁটির জোর আছে তাদের ভাগ্যেই চাকুরী।

Dhaka University Institutional Repository

এই সংকটের সাথে দায়ী দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা। যুবসমাজকে নিয়ে রনবীর একটি কার্টুন--

একটি জনসভা যেখানে উস্কো খুস্ক চুলের একজন যুবক বক্তৃতা দিচ্ছে এই বলে যে, "ভাইসব....আমি রাজনীতিবিদ নই...একটা চাকরির জন্য একজন মামা পাবার আশায়... এই সভা"।

এই কার্টুনে রনবী স্বাধীন বাংলাদেশের যুব সমাজের একটি ভয়াবহ সমস্যা- বেকার সমস্যা ও সেই সমস্যাকে যেটি আরো ভয়াবহ করে তুলেছে সেই তদবিরকারীদের তদবির দ্বারা চাকরি প্রাপ্তির বিষয়কে তুলে ধরেছেন।

ফাইল মুভমেন্ট চার্জ- ফাইল আটক রেখে 'ফাইল মুভমেন্ট চার্জ' (ঘুষ) আদায় সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একটি প্রধান কাজ। বৈধ কাগজও ফাইল মুভমেন্ট চার্জ (ঘুষ) ছাড়া আদায় করা সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দেশে সরকারী অফিসগুলোতে ফাইল যে কত দেরীতে ছাড়া পায় তা ভূক্তভোগী মাত্রেই জানেন। 'লাল ফিতার দৌরাত্ম' বলে কথাটি অফিস-আদালতের ক্ষেত্রে বহুল পরিচিত। কোন ফাইলের কাজ সমাপ্ত হয় তা সবাই জানে। এমনকি অফিসগুলোতে অনেক ফাইল হয়তো ছাড়াই পায়না । এই ব্যাপারটিকে বোঝানোর জন্য রনবী একটি কার্টুনে দেখিয়েছেন যে, একজন লোক ফাইল ছাড়ানোর জন্য ছাগল মানত করতে যাচেছন।

বিদ্যুৎ সংকট- ব্রত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে, যার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিদ্যুৎ বিবেচিত। শুধুমাত্র বিদ্যুতের অভাবে দেশের কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, পঁচে গিয়েছে হিমাগারে রক্ষিত পচনশীল কৃষিপণ্য, বিঘ্নিত হয়েছে ভরমওসুমে সেচকার্য। ব্যাহত হয়েছে কৃষি উৎপাদন। বিদ্যুতের ঘাটতির কারণে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এর প্রভাবে কমে যায় জিডিপি।

Dhaka University Institutional Repository

সারা দেশে বিদ্যুৎ সংকটে জনজীবন অতীষ্ঠ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় ভূক্তভোগীরা বিদ্যুতের দাবিতে মিছিল, মিটিং, ঘেরাও, ভাঙচুর, অবরোধ শুরু করে। নিরাপত্তহীনতায় ভোগেন বিদ্যুৎ কর্মীরা। পুলিশী প্রহরার ব্যবস্থা করতে হয়েছে অনেক কেন্দ্র উপকেন্দ্রে। লোডশেডিং ও লো-ভোল্টেজের কারণে অফিস-আদালত, শিল্প-কারখানায় কাজে অসুবিধা হয়, তেমনি শিক্ষার্থীরার পড়ে বিপাকে। বিদ্যুৎ না থাকায় পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়নি। 'দৈনিক বাংলা'য় প্রকাশিত একটি কার্টুনে রনধী বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অবস্থা বুঝিয়েছেন।

উপরোক্ত কার্টুনে একজন বিদ্যুৎ গ্রাহককে দেখানো হয়েছে যার ঘরে কোন বিদ্যুৎ নেই এবং তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে বলছেন,

"....খালি ঘরই অন্ধকার নয়। কুপি, হারিকেন, মোম কিনে পকেটও অন্ধকার করে বসে আছি....."

এতে বোঝা যায়, বিদ্যুৎ গ্রাহকরা বিদ্যুৎ এর অভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছেন হারিকেন, মোম, কুপি প্রভৃতি কিনতে এবং এসব কিনতে গিয়ে তারা অর্থনৈতিক সংকটেও পড়ছেন। আর সেই সাথে বিদ্যুৎ সংকটতো আছেই।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনযাত্রার মান- বাংলাদেশের দরিদ্র জনসাধারণের মাথাপিছু আয় কম বলে তাদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্নে। এ বিষয়টিও রনবীর কার্টুন এড়িয়ে যায়নি। দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর অবস্থায় বাস করে আমাদের দেশের শহরগুলোর বস্তিবাসীরা। তাদের অধিক দারিদ্রহেতু চালচলন, কথা-বার্তা সমাজের মধ্যবিত্ত বা উচচবিত্তের সাথে মিলেনা। কারণ আমরা যেটাকে তথাকথিত ভদ্র ভাষায় বা আচরণের সাথে বলি সেটাও তাদের কাছে অস্বাভাবিক। এ কারণেই 'বিচিত্রা'য় টোকাই কার্টুনে রনবী একটি সুন্দর উপস্থাপনা করেছেন এভাবেঃ

একটি কাক খাদ্যরত টোকাইকে প্রশ্ন করছে, খাইতাছস বুঝি?! উত্তরে টোকাইয়ের ব্যঙ্গার্থক পরিবেশনা, আমরা আবার খাইলাম কবে? "গিলি" ক?!!...

ভাষার অসমতাও যে সামাজিক অসমতার সৃষ্টি করে সেটি এই কার্টুনটি আমাদের দেখিয়ে দেয়। ভাষার ব্যবহার যে (ভাষাতাত্ত্বিক Hudson এর মত অনুযায়ী) শ্রেনীগত, দলগত পার্থক্য বিভিন্ন সমাজে তৈরী করে দেয় অর্থাৎ "গিলি" শব্দটি যেমন উচু শ্রেনী বা ভদ্র শ্রেনীর চোখে নিম্নপর্যায়ে পড়ে। তেমনি মানুষ হিসেবে টোকাইও তাদের কাছে একই শ্রেনীতে পড়ে। তাই কার্টুনটিতে টোকাইয়ের কথা মত খাওয়াবাচক শব্দটিকে টোকাইয়ের শ্রেনী মতে "গিলি" ব্যবহারই উপযুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

খাঁটি বাঙালী- বাংলাদেশ হওয়ার আগেও অবাঙালীরা ধনী ছিল পরেও তারাই ধনী। ধনী হয়ে এবং ধনী হওয়ার প্রক্রিয়ার ভেতরে তারা বাঙালিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। পরাধীনতার যুগে ইংরেজদের দুশ বছরে, পাকিস্তানীদের চব্বিশ বছরে পরাধীন বুর্জোয়াদের একাংশের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী অভিযান কার্যকর ছিল সেটি দূর্বল হয়ে পড়েছে। পরাধীন হবার স্বাধীনতা বাঙালী বুর্জোয়া পেয়ে গেছে। ছুটেছে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের অভিমুখে।

বাংলাদেশের খাঁটি বাঙালী কারা? প্রশ্নটি অনেকেরই। লুঙ্গি, ধুতি, পাজামা-পাঞ্জাবী পরা কিংবা খালি গায়ের খেটে খাওয়া মানুষেরাই বাঙালী নাকি কোট-প্যান্ট পরা বাবুরাই খাঁটি বাঙালী। এ প্রসঙ্গটাকেই তুলে এনেছেন রনবী তাঁর '৭০ এর দশকের একটি কার্টুনেঃ

টোকাই কোট-প্যান্ট, টাই পরা, গাড়িওয়ালা একজন ব্যক্তিকে বলছে- "আপনাগো মতন বাঙালী হইতে আমার কয় হাজার বছর লাগবো...?"

পরিবহন- যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থায় তেমন কোন পরিবর্তন ও অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বাংলাদেশের যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থায় সড়কপথের গুরুত্ব সর্বাধিক। জীবনযাত্রা আগের তুলনায় অনেক বেশী দ্রুত হওয়ায় জলপথের গুরুত্ব কমে গিয়েছে। রেল ব্যবস্থা এক জায়গায় স্থির হওয়ায় তার কোন সম্প্রসারণ হয়নি। সম্প্রসারণ ঘটেছে একমাত্র সড়কপথেরই।

Dhaka University Institutional Repository

সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার এই উন্নতির সুফল অনেক বেশী পাওয়া যেত যদি না থাকতো এতে অরাজকতা । হরেক -রকম সমস্যায় আক্রান্ত এ উপখাত । সড়কের বিস্তৃতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বাস-ট্রাকের সংখ্যা । এর প্রায় সর্বাংশই ব্যক্তিমালিকানাধীন । বেসরকারী খাতের প্রাধান্য নিরঙ্কুশ । সরকারী মালিকানায় বিআরটিসির ভূমিকা খুবই গৌণ । বেসরকারী পরিবহন খাত এতোটাই শক্তিশালী যে, তারা বাংলাদেশের সড়ক
পরিবহন কর্তৃপক্ষের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করে না । যখন খুশি ভাড়া বাড়ানো, অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই, ছাদে যাত্রী উঠানো, আনফিট গাড়ীকে ফিট বলে আনাড়ী ড্রাইভার দিয়ে চালানো নিত্যদিনের ঘটনা । ফলে মানুষের অসন্তোষ বাড়ে, বৃদ্ধি পায় দূর্ঘটনার পরিমাণ ।

দেশে জনসংখ্যা বেড়েছে অত্যধিক হারে সে সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ে প্রচুর সমস্যাও । কিন্তু সে অনুযায়ী উন্নয়ন বাড়েনি সমান হারে । তাই দেখা যায় দেশে কোন উন্নয়ন বা সমস্যার সমাধান হলেও তা মূল সমস্যার তুলনায় এত কম হয় যে এই উন্নয়ন ধর্তব্যের মধ্যে আনা যায় না । এই বিষয়টিকেই রনবী পরিবহন সমস্যার মধ্য দিয়ে একটি কার্টুনে তুলে ধরেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৯ সালের এই কার্টুনটিতে একটি খবর দেখানো হয়েছে যাতে বলা হয়েছে, রাজধানীতে আরও ২০টি বাস চালু হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এক যাত্রী ভদ্রলোক আর একজনকে বলছেন যে, হ্যান্ডেলে ঝোলার জন্য আরও ২০ হাজার যাত্রী রেডী। অর্থাৎ প্রচুর যাত্রীর জন্য অপ্রতুল বাসের কথা বোঝানো হয়েছে। পরিবহন সংক্রান্ত অপর একটি কার্টুনে দেখানো হয়েছে একজন বাসের হেলপার মাইকে করে বলছে যে,

.... আইসা পড়েন।... এই বাসে ঝুলনের মেলা ব্যবস্থা আছে। ...আইসা পড়েন।

এই কার্টুনটিতে রনবী দেখিয়েছেন সিটে বসার পরও বাসের বিভিন্ন জায়গা ধরে ঝুলে থাকার ফলে জনসংখ্যার চাপে নুয়ে পড়া পরিবহন ব্যবস্থাকে।

পরীক্ষায় নকল- শিক্ষার ক্ষেত্রে নকল একটি বড় সমস্যা। নকল আগে একেবারেই ছিল না এমন নয়; কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে এই মারাত্মক ব্যধি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এদেশের সবাই মনে করে যে তারা স্বাধীন হয়েছে। যারা শিক্ষার আলো পেয়েছে তারা নিজেদেরকে স্বাধীন মনে করে আরো বেশী, পরীক্ষার হলেও তারা স্বাধীনতা চায়। এক্ষেত্রে স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়ায় অবাধ লুণ্ঠন। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নীতিই পরীক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। যার ফলে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো পরিণত হয়েছে নকলের প্রতিযোগিতা কেন্দ্রে।

Dhaka University Institutional Repository

বোর্ডের দূর্নীতি ও প্রশ্নপত্র ফাঁস- স্বাধীনতা উত্তরকালে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দূর্নীতি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। প্রতিটি শিক্ষাবোর্ড দূর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এক শ্রেনীর কর্মচারী ও কর্মকর্তার যোগসাজশে এই অপকর্মগুলি সংঘটিত হয়। এতে অপরাধের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের ব্যবস্থা হয়না। নেই কোন জবাবদিহিতা। তারা বিভিন্ন কু-কৌশলে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। এ বিষয়ের উপর রনবীর একটি কার্টুন।

একটি ছেলে টোকাইকে বলছে, ...জানিস....এবার বোর্ডের নকল খাতা পরীক্ষকের কাছে আর আসল খাতা 'মুদির' কাছে পাওয়া গেছে...টোকাইয়ের বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর, ...তোমাগো বোর্ডটা অহন কাগো হাতে?.... আসল না নকলগো? .....

এখানে বোঝানো হয়েছে এত নির্লজ্জ ভাবে নকলের হার বেড়ে গিয়েছে যে, পরীক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে হয় তাদের নীতি ও বিবেক বিসর্জন দিয়ে মানুষ নামধারী নকল মানুষে পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অপর একটি কার্টুন 'দৈনিক বাংলা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। একজন বোর্ড অফিস এর সামনে দাঁড়িয়ে অন্য এক লোককে জিজ্ঞাসা করছে,

"সদ্য ফাঁসকৃত আগামী বছরের একসেট এইচ.এস.সির প্রশ্নপত্র কোথায় পাওয়া যাচ্ছে ভাই....." । এতে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সব জিনিসপত্রের মতো প্রশ্নপত্র কেনা সম্ভব অসাধু কর্মকর্তাদের কাছ থেকে।

অপরাধ ও সন্ত্রাস জনগণের সবচেয়ে বড় সমস্যা। সন্ত্রাস ও অপরাধ ক্রমাগত বেড়েছে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়েছে। দেখা যায় অনেক দূর্ধর্ষ অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের অনেকে গ্রেফতার হয় আবার তারা বিভিন্ন ভাবে ছাড়াও পেয়ে যায়। ফলে জননিরাপত্তাহীনতা ভীষণ ভাবে বেড়ে যায়।

রনবীর নিম্মোক্ত কার্টুনটি নেয়া হয়েছে সত্তরের দশকে 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকা থেকে। ঐ কার্টুনে রনবী দেখিয়েছেন,

Dhaka University Institutional Repository

সে সময়কার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। কার্টুনটিতে একটি খবর দেয়া হয়েছে যে, কোর্ট হাজত থেকে ১৮ জন আসামী পালিয়েছে। খবরটি পড়ে একজন গৃহকর্তা যিনি একজন আসামী ধরিয়ে দিয়েছিলেন,তিনি তার স্ত্রীকে বলছেন যে, আমরা যাকে ধরিয়ে দিয়েছিলাম.. ...সে পালায়নিতো?

অর্থাৎ এ কার্টুন দিয়ে রনবী দেখিয়েছেন যে, জনসাধারণ কোন আসামী ধরতে সাহায্য করলে পরবর্তীতে সে আসামী ছাড়া পেলে বা পালিয়ে গেলে জনগণ যে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে সেটাই। কারণ জেল থেকে আসা এই আসামী যে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল তার উপর প্রতিশোধ নিতে পারে আর এ কারণেই জনসাধারণ সাহস করে আইন- শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আসামী ধরতে অসহযোগিতা করে।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ অনেক দিক থেকে অসংগঠিত ছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব ছিল। শরনার্থীদের সমস্যা ছিল। অস্ত্র উদ্ধার ছিল আরেকটি বড় সমস্যা। অস্ত্র স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতেও ছিল। এছাড়া ছিল দেশের ভিতরে ও বাইরে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির চক্রান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্র ধর্মীয় মতবাদ এই দেশের সমাজব্যবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। রাতারাতি শত শত লোক সম্পদশালী হল। পক্ষান্তরে ঘুষ, দূর্নীতি, নারী নির্যাতন, অভাব-অনটন, বেকারত্ব, সন্ত্রাস, খুন, মূল্যবোধের অবক্ষয় বেড়েই যায়।

মুক্তিযুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে সমস্যার সমাধান হয়নি বরং তা দিন দিন প্রকট হচেছ। জনজীবনে মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা কার্টুনের মাধ্যমে তুলে ধরা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু রনবী একজন গুণী শিল্পী হিসেবে কাজটি অত্যন্ত সুচারুরূপে দক্ষতার সংগে করে যাচেছন বাংলাদেশ সৃষ্টির পূর্বকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত। গড়ে তুলেছেন জনগণের মধ্যে সচেতনতা। বৃদ্ধি করে চলেছেন দূর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনা। তিনি নীরবে তাঁর শিল্পের মাধ্যমে দেশের কাজ করে যাচেছন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

রনবীর কার্টুনের সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব

"যে কোন সভ্যতার উৎকৃষ্ট ব্যারোমিটার হলো তার কবি-সাহিত্যিক"।

-কৃষণ চন্দর

সত্যিকার অর্থে উর্দূ সাহিত্যের জনপ্রিয় এই লেখকের কথাটি সকল সৃজনশীল মানুষের বেলায় প্রযোজ্য। সভ্যতার ক্রমধারায় কবি, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, লেখক এঁরাই হয়ে উঠলেন সমাজের সর্বাপেক্ষা সচেতন জনগোষ্ঠী। যুগে যুগে প্রতিটি সভ্যতার চিন্তা-চেতনা, মননশীলতা, সৃজনশীলতা ইত্যাদি লালিত হয়ে আসছে তাঁদের মাধ্যমে। এক যুগের প্রগতি আরেক যুগের হাতে তুলে দেয়ার দায়িত্ব তাঁরাই পালন করেন সবার অলক্ষ্যে। সেই সৃজনশীল সচেতন জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে আধুনিক এবং স্পর্শকাতর স্বীকৃতি কার্টুন। যাঁরা কার্টুন আঁকতেন এক সময় তাঁদেরকে চিত্রশিল্পী হতে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হত না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই কার্টুন তার জায়গা দখল করে নিতে শুরু করে। আর যারা কার্টুন আঁকতে শুরু করলেন তাঁরাও অধিকতর ভিন্ন আঙ্গিকে পরিচিত হতে থাকলেন। যে সকল চিত্রশিল্পীরা কার্টুন আঁকার দিকে মনোযোগ দিলেন তাঁদের সাথে যোগ হল নতুন বিশেষণ "কার্টুনিস্ট"। বৃটিশ আমল থেকে আমাদের দেশে কার্টুন আঁকার প্রচলন শুরু হয়। বৃটিশ এবং বাঙালীদের বিচিত্রমুখী মিথস্ক্রিয়া সে সময়ে বাঙালী সমাজে যে অশুভ প্রভাব বিস্তার করে ছিল তারই বিচিত্র রূপ হাস্যরসের মাধ্যমে পরিবেশনের জন্য চিত্রকররা বেছে নিয়েছিলেন কার্টুনকে। অশ্লীলতা ছিল সে সব শিল্পকর্মের মূল উপজীব্য। তবে এই অশ্লীল ধারা নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা সৃষ্টির গতিময় স্রোতস্বিনী হিসেবে রূপ লাভ করেছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, মুর্তজা বশীর, বিজন চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম, কাইয়ুম চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীগণ স্বদেশের ঐতিহাসিক সংকটকালীন সময়ে কার্টুনের মাধ্যমে যে ভাবে মানুষের হৃদয় আলোড়িত করেছিলেন তা কার্টুনকে অনেক শক্ত অবস্থানে নিয়ে গেছে। পোস্টার,

Dhaka University Institutional Repository

মিনিপত্রিকা, লিফলেট প্রভৃতি ছাড়িয়ে কার্টুন আজ সংবাদপত্র সহ বিভিন্ন প্রকার মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় উপাদান হয়ে উঠেছে।

একটি ব্যাপার খুবই লক্ষ্যণীয় যে, কার্টুনের এই উত্তরণে চিত্রশিল্পীদের সার্বজনীন অবদান নেই বললেই চলে। স্বল্প সংখ্যক যশস্বীও প্রতিভাবান চিত্রশিল্পীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সাধারণ পাঠকগণ কার্টুনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এই হাতে গোণা কয়েকজন শিল্পীদের অন্যতম একজন রনবীর। তিনি সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি প্রভৃতির নানামুখি দিক যেভাবে কার্টুনের মাধ্যমে তুলে ধরেন তা পাঠকগণের সচেতন বিবেক বোধকে নাড়া দেয়।

সামাজিক গুরুত্বঃ

পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ মানুষকে ধীরে ধীরে অলিখিত সামাজিক চুক্তির দিকে ঠেলে দেয়। নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বিভক্ত হয়ে পড়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে। ক্রমশঃ বাড়তে থাকে মানুষ। সেই সাথে চাহিদাও। ভূমির উৎপাদন অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই 'যোগ্যতমরা সমাজের নেতৃত্বে চলে আসে। কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য তাদের স্বার্থে চালু করা হয় দাস ব্যবস্থা। আর এই দাসব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই সমাজের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় রাষ্ট্রযন্ত্র। এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ঘিরে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হয় সামন্তবাদী শ্রেণী তথা অভিজাত শ্রেণী। মুঘল আমল থেকে শুরু করে আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশেও বিশেষ একটি শ্রেণী কখনো সামন্তবাদী, কখনো অভিজাত শ্রেণী, আবার কখনো সুবিধাভোগী শ্রেণী রূপে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে আসছে। এই শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে সমাজের গতিধারা নিজেদের মতো করে প্রবাহিত করতে চায়। কিন্তু এভাবে তো সমাজ চলতে পারে না। চললেও সেটাকে চলা বলা যায় না। বড়জোড় সময় কাটছে। সমাজের বৃহত্তর অংশ যখন নূন্যতম মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম হয় তখন বিবেকবানদের বিবেকে সত্যিকার অর্থেই রক্তক্ষরণ হয়। আর সেই ক্ষরিত রক্তের কিছু ছাপ রনবীর কার্টুন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়টা বিশ্ব পরিবর্তনে ও উন্নয়নের জন্য খুবই উল্লেখযোগ্য। এই উন্নয়নের আঁচ আমাদের দেশকে স্পর্শ করতে পেরেছে অতি ক্ষুদ্র পরিসরে। ব্রিটিশদের শোষণ নির্ভর ভূমি ব্যবস্থা ও পাকদের ঔপনিবেশিক কর্মকাণ্ড এবং স্বাধীনতাত্তোর কালের লক্ষহীন অর্থনৈতিক নীতির কারণে ভূমিহীন, ভাসমান, দারিদ্র ও অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে আশংকাজনকভাবে। সুখ -দুঃখের মধ্যে যে ব্যবধান ধনী-দরিদ্রের মধ্যেও ঠিক সে ব্যবধানই ধরা পড়েছে রনবীর চোখে।

আর্থিক ব্যবধানটা সমাজকে মূলত দুইভাগে ভাগ করে দিয়েছে। আর্থিকভাবে সামর্থবান ব্যক্তিরা দরিদ্র শ্রেণীর মানুষগুলোকে মর্যাদার চোখে দেখে না। প্রগতির ধবজাধারী সমাজপতিদের মানবাধিকার, মানুষের সমতা ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর শ্লোগানগুলি মায়াকান্না ছাড়া কিছুই নয়। মানবাধিকার দিবস, শিশু দিবস, নারী দিবস ইত্যাদি সুবিধা ভোগীদের দুঃখ বিলাস ছাড়া কিছুই নয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমোন্নতিতে বেশীর ভাগ মানুষকেই সম্পৃক্ত করা যাচ্ছে না। আর যারাই প্রযুক্তিগত সুবিধা ভোগ করছে তারাও যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। জনপ্রিয় সাহিত্যিক যাযাবর হয়তো তাই বলেছিলেন *"বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ"*। পারস্পরিক মেলামেশা, কথাবার্তা এমন কি ঈদের দিনের কোলাকুলি প্রভৃতিতে কেবল লোক দেখানো আনুষ্ঠানিকতা। এসবে আন্তরিকতা ও পারস্পরিক মমত্ব বোধ খুঁজে পাওয়া বড়ই দুষ্কর হবে। রনবীর সেই টোকাই বারবার সেকথাই বলে যাচ্ছে- কখনো নিজের হয়ে, কখনো বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে। রনবী নিজের পর্যবেক্ষণ, বিচক্ষণতা, দৃষ্টিভঙ্গী গুলিই যেন তুলে দিয়েছেন 'টোকাই'- এর কথনে।

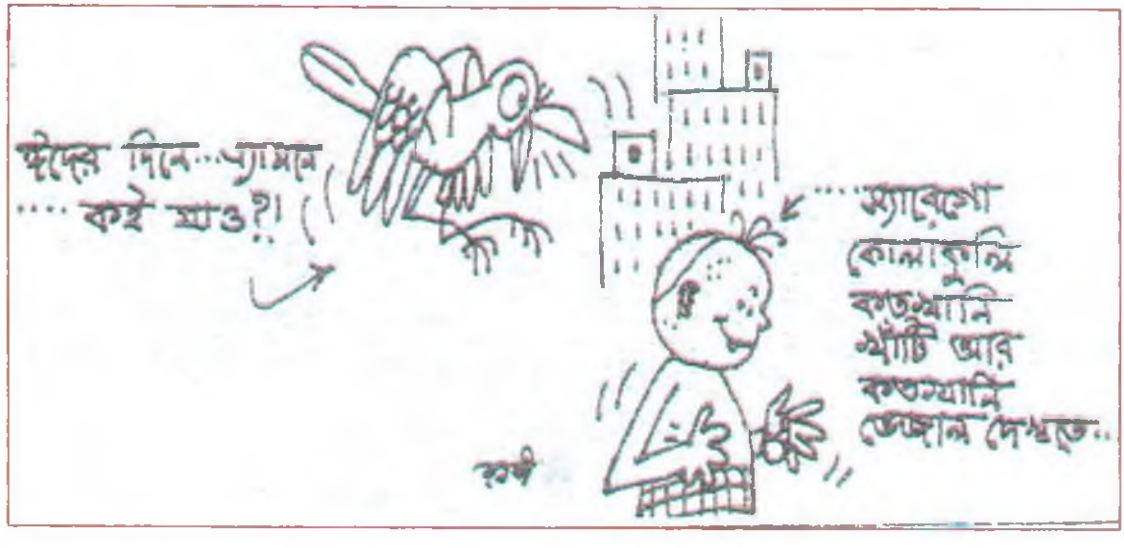

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষায় নকল, শিক্ষকদের দীনতা, সড়ক দূর্ঘটনা, বেকারত্ব, অর্থের অশুভ প্রভাব, থেকে শুরু করে লাইটপোস্টের তথৈবচ অবস্থা ইত্যাকার কোন কিছুই টোকাইয়ের দৃষ্টি এড়ায় না। ভাসমান মানুষের মধ্যে 'টোকাই' সবচেয়ে অসহায় শ্রেণীর । এ টোকাইরা পথের শিশু কিংবা কিশোর । কেউ মা হারা কেউ বাবা হারা । কারো কারো বাবা মা কেউ-ই নেই। একেক জন একেকভাবে হারিয়েছে তাদের বাবা মাকে। একেক জনের জীবনগল্প একক রকম। আর রনবীর 'টোকাই' বাবা মাকে হারিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে। জীবনের সবচেয়ে কষ্টময় রূপ সে দেখেছে। তার দেখা সমাজই প্রকৃত সমাজ। সাহেবদের রঙিন চশমায় দেখা সমাজকে সমাজের সংজ্ঞার আওতায় আনা ঠিক হবে না।

পণ্যদ্রব্যের মূল্যের উপর সামাজিক জীবন যাত্রার মান অনেকাংশে নির্ভর করে। যে কোন ছোট বড় ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে পণ্যমূল্যের অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতি দেখা যায়। রমজান মাস এবং বন্যার সময় মূল্য তো বাড়েই, এমনকি (মধ্যপ্রাচ্যে) কোন দেশে যুদ্ধ হলেও অযৌক্তিক কারণে মূল্য বাড়িয়ে দেয় মুনাফাখোররা । এদেরই দৌরাত্ম্যে সমস্যায় পড়ে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং চাকরিজীবী মানুষ। মাঝে মাঝে বাড়ে বেতন । কিন্তু এ বাড়ণ খুব একটা কাজে লাগে না। পটকাবাজ ও মুনাফাখোররা বড়ই সতর্ক। পণ্যমূল্য এদেরই ইচ্ছায় উঠানামা করে। সীমিত আয়ের মানুষগুলোর জন্য মাসিক বাজেট অনুযায়ী চালিয়ে নিতে পারাটা পরম তৃপ্তির ব্যাপার। এসব সাধারণ অথচ নিরসনযোগ্য সমস্যাগুলিকে তিনি কার্টুনের ছলে দেখিয়েছেন পাঠকদের সচেতনতার মানসে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিদিন প্রতিক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে এ সমাজ। জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অভাব। খাদ্যের অভাব। বস্ত্রের অভাব। বাসস্থানের অভাব। এটা সমাজের একদিক। অপর পিঠ অসম্ভব রকম জৌলুসে ভরা। সে সমাজে টাকার ছড়াছড়ি। ভোগ বিলাস আর অপচয়ের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। এ সমাজ ভাবে না ভাবতে চায় না - কি হচ্ছে দুঃখময় জগতের বাসিন্দাদের। দুই বেলা দূরে থাক। একবেলার আহার জোটাতে পারেনা হাজার হাজার বনি আদম। ডাস্টবিন তাদের খাদ্যের অন্যতম উৎস।

Dhaka University Institutional Repository

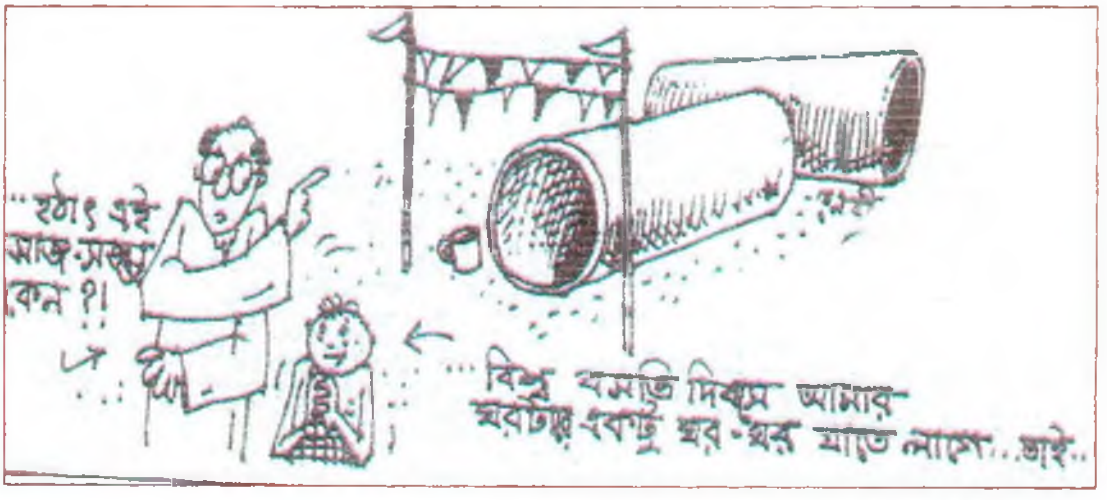

Dhaka University Institutional Repository

এল স্বাধীনতা। সেই সাথে এল লুটেরা । কেউ রাজনীতিবিদের বেশে। কেউ ব্যবসায়ী হয়ে। কেউ শিল্পপতি রূপে। সবার স্বার্থ যখন একই স্রোতে তখন পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে এগিয়ে গেল। ফলে বানের পানি মত এল কালো টাকা, আঙ্গুল ফুলে হল কলা গাছ।

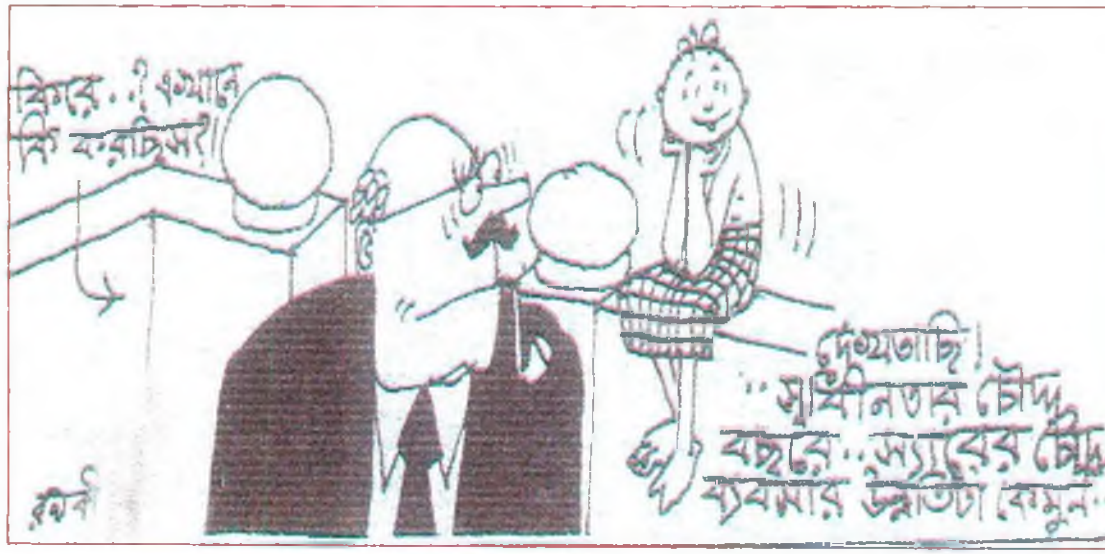

তারপরের কাহিনী বড়ই মর্মান্তিক। সেই কালো টাকা দূষিত করল সমাজ- আর সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ। নষ্ট সমাজ উগরে দিল রাহাজানি, ছিনতাই, ঘুষ ও আত্মিক দূরত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

টাকা বসল চালকের আসনে। টাকাই হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বড় চাওয়া পাওয়া। সবাই ছুটছে টাকার পিছনে। শিক্ষা দীক্ষা থেকে শুরু করে কোরবানীর মত ধর্মীয় আচারেও টাকার নির্লজ্জ প্রর্দশনী । জ্ঞানার্জনটা যেন কোন কিছুই নয়। সার্টিফিকেটটাই আসল। আর সার্টিফিকেট মানেই চাকরি। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সেই টাকাই! তাই তো ছলে বলে কৌশলে চাই সার্টিফিকেট। ফলে ছড়িয়ে পড়ল নকলের মহামারী। বড় ভয়ানক এই ব্যধি। বহুদূরে চলে গেছে সেই ব্যধির শিকড়। সমাজের এই ব্যধি রনধীকে ভয়াবহ কষ্ট দেয়। তাইতো তাঁর 'টোকাই' বলছে "লেখাপড়া?! না নকল!!??"। ছোট্ট এই উক্তি। কিন্তু তাৎপর্য্যের বিশালতা কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, আমলা, কেরানী থেকে শুরু করে বাস- ট্রাক চালক কাউকেই রনধী রেহাই দেননি। সমাজের প্রতিটি স্তরের ক্ষত এবং সেই ক্ষতের জন্য দায়ী লোকগুলির দোষত্রুটি তিনি নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

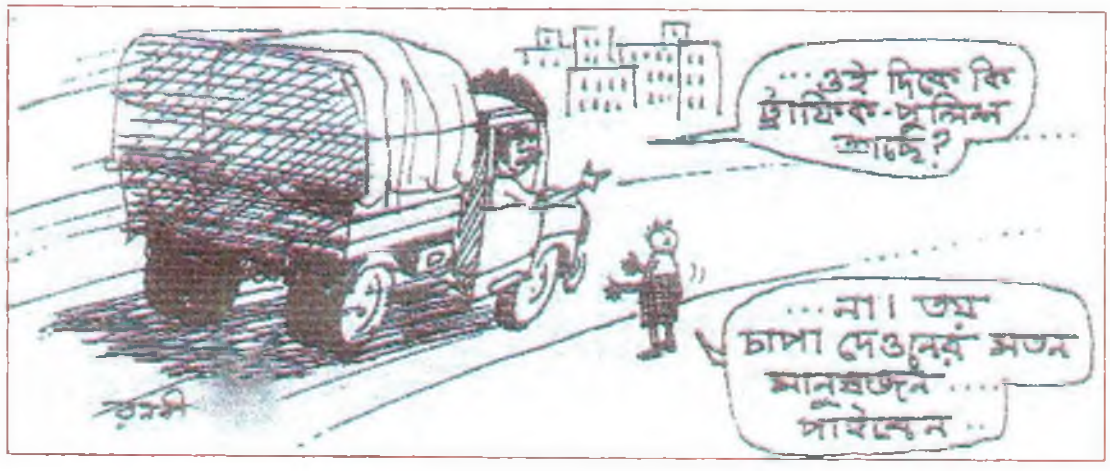

Dhaka University Institutional Repository

কার্টুনিস্ট হিসাবে তার যে দায়িত্ব তা তিনি পালন করছেন। সমাজপতি এবং সমাজের মানুষগুলি যদি এর গুরুত্ব বুঝে তবে বাকি কাজটা শুরু হতে সময় লাগবেনা।

রাজনৈতিক গুরুত্ব

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে রাজনীতি ও গণতন্ত্রের যেরূপ বিভাগ হবার প্রয়োজন ছিল নানা কারণে সেরূপ বিকাশ লাভ করতে পারেনি। এমন কি স্বাধীনতার পর যে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বচ্ছতা আশা করা হয়েছিল, তার কোনটারই বাস্তব প্রকাশ দেখা যায়নি। স্বাধীনতা বিরোধীদের সাধারণ ক্ষমা, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অদক্ষতা ও স্বজনপ্রীতি দেশকে অরাজকতার দিকে ঠেলে দেয়। পরবর্তীতে ৭৫ সালের মর্মান্তিক ঘটনা ইতিহাসের গতিধারাকে দিল পাল্টে। পর পর দুটি সামরিক শাসন এবং সেগুলোর লোক দেখানো গণতন্ত্রায়ন সুস্থ রাজনীতির পরিবেশকে দিল নষ্ট করে। নিজেদের অনুগত শ্রেণী সৃষ্টির লক্ষ্যে দূর্নীতির আশ্রয় নিয়ে টাকা বানানোর সুযোগ করে দেয়া হল। এ সময়টা ছিল সাধারণ নাগরিক সমাজের নৈতিকতার জন্যে কঠিন পরীক্ষা। অনেকেই স্রোতেই গা ভাসিয়েছে। উত্থান হল নতুন নতুন রাজনীতিবিদের।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা বিরোধীদের পুনর্বাসিত করা হল টাকা এবং রাজনীতি দিয়ে। শুধু তাই নয় রাজাকারদের ক্ষমতায়ন স্বাধীনতার চেতনাকে করল অবজ্ঞা। দিনে দিনে সাহস বেড়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের। যা খুবই দুঃখ জনক। সেই ঝুঁকিপূর্ণ দিনগুলিতে এদের বিরুদ্ধে আঁকা প্রচন্ড সাহসের ব্যাপার। ৮০ এর দশকে আঁকা তার কার্টুনগুলো স্রোতের প্রতিকূলে চলার চেয়েও কঠিনতর।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সততা থাকলে সম্পদের সুসম বন্টন করে দেশের সীমিত সম্পদের মাধ্যমে সাধারন মানুষের আর্থিক অবস্থাকে সন্তোষজনক পর্যায় নিয়ে আসা সম্ভব। অথচ রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে আমরা যা পাচ্ছি তা কেবল পেছনে টেনে যায়য়ার প্রক্রিয়া। রাজনীতি এখন সম্পদ আহরনের হাতিয়ার। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে রক্ষকরাই হয়েগেল ভক্ষক, দেশের মানুষের অন্ন - বস্ত্র - বাসস্থানের চিন্তা তাদের নেই । ক্ষুধা আর দারিদ্রের অভিশাপ কাটল না । অসহায় দরিদ্র এই মানুষেরা ক্ষমতা চায় না । বিশাল বিশাল বাড়ি চায় না, সম্পদের পাহাড় চায় না, চায় কেবল দুমুঠো অন্ন । আর এটাই তাদের রাজনীতি। রনবীর টোকাই ও যেটা বুঝে ফেলেছে।

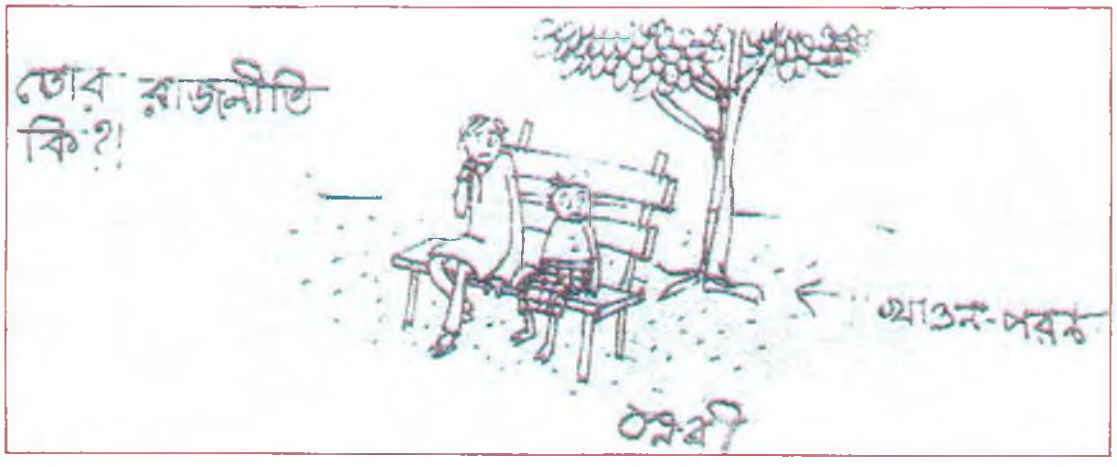

ভোট প্রধান গণতন্ত্রে মানুষের কোন মর্যাদা নেই । ভোটই রাজনীতিবিদদের লক্ষ্য। যখন ভোট আসে গরীব দুঃখী মেহনতী মানুষের কদর যায় বেড়ে। কারণ তাদের কাছেই রয়েছে সস্তা দামের অমূল্য ভোট।

Dhaka University Institutional Repository

কিছু নগদ প্রাপ্তি যোগ হয়, কয়েক বেলা ভরপেটও হয়তো হয়ে যায়। শীতের সময় ভোট হলে গরম কাপড় ও যায় জুটে। তাইতো টোকাই বলছে "ভোটের আশায় আছি"।

ক্ষমতায় যাওয়া কিংবা টিকে থাকা এখন রাজনীতি। নীতিহীন এই রাজনীতি। যে কোন উপায়ে চায় জয়ী হতে ক্ষমতায় যেতে। প্রয়োজনে মাস্তান, সন্ত্রাসী, অস্ত্রবাজদেরও ব্যবহার করা রাজনৈতিক প্রথাতে পরিণত হয়েছে। যা চরম হতাশাজনক। 'সংসদ মানে সন্ত্রাস'।

Dhaka University Institutional Repository

ভোট আসলে রাজনীতিবিদদের কণ্ঠে মিষ্টি মধুর প্রতিজ্ঞা। অথচ ভোটের পর কিছুই মনে থাকে না। এটা যেন আবশ্যকীয় চিত্র। রনবী ও থেমে নেই। বারবার বলছেন তার কার্টুনে। দ্বিধাহীনভাবে, নিঃসংকোচে, নিতান্ত সরল এবং অকপটে। নভেম্বর - ডিসেম্বরের আন্দোলন বাতিক থেকে শুরু করে কর্মহীন অবসর জীবীদের রাজনীতিকেও ঠাঁই দিয়েছেন তাঁর কার্টুনে। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বেসামরিক আমলা যখন রাজনৈতিক মঞ্চ দাবড়ে বেড়াচ্ছে তখন রনবীর কার্টুনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে কষ্ট হয় না।

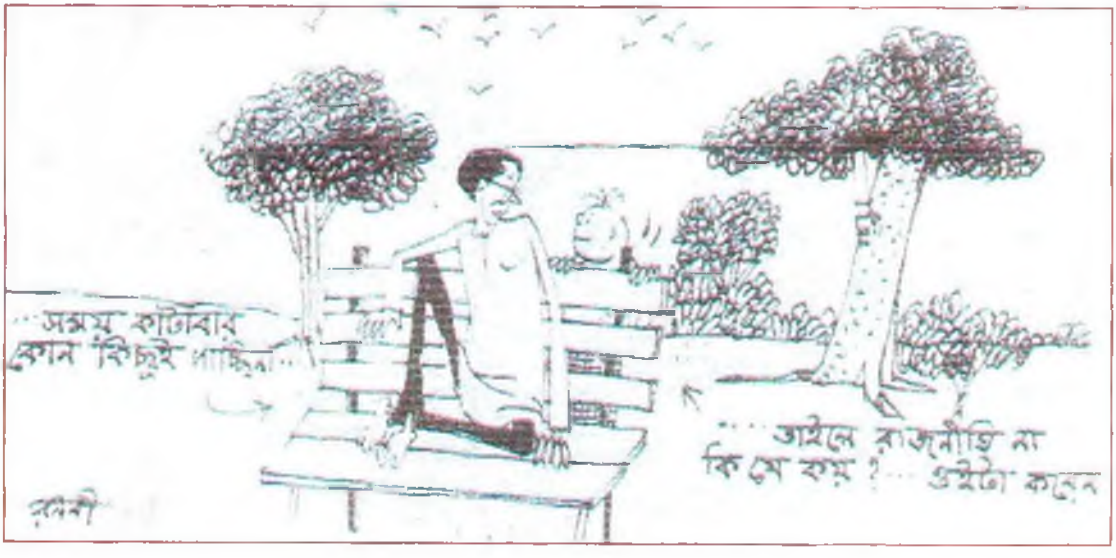

Dhaka University Institutional Repository

নষ্ট রাজনীতির এই সময়ে রনবীর কার্টুন বুদ্ধিভিত্তিক স্বচ্ছতার এক বিরল দৃষ্টান্ত কারণ দুর্দশাগ্রস্থ এই কঠিন সময়ে বুদ্ধিজীবিদের বুদ্ধির তারিফ করা গেলেও সদিচ্ছা ও সাহসের তারিফ করা যায় না।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রনবীর কার্টুনের একটি সার্বজনীন বোধগম্যতা রয়েছে। আর তাঁর সৃষ্টিশীল কার্টুন আরো একধাপ এগিয়ে। এটি মানুষের চিন্তাকে নাড়া দেয় অতি সহজেই। সব মানুষের চিন্তা করার ইচ্ছা, ক্ষমতা এবং গভীরতা সমান নয়। এ কারণেই শাব্দিক বর্ণনা খুব কম সংখ্যক মানুষকেই আলোড়িত করতে পারে। কিন্তু রনবীর সৃষ্টিশীল কার্টুন তাৎক্ষণিক অতি সাবলীল ভাবে মানুষের চিন্তার সাথে যোগাযোগ ঘটাতে সক্ষম হয়।

বক্তব্যের স্পষ্টতা দিয়ে রনবীর কার্টুন তাঁর অবস্থান বুঝিয়ে দেয়। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা অন্য যেকোন বিয়য়ে রনবী তাঁর সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট, প্রাঞ্জল বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর কার্টুনের অবস্থানকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পান।

অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন একজন কার্টুনিস্ট এর কার্টুন সমাজের নির্দিষ্ট একটি বা দুটি বিষয়ের উপর জোর দেয়। কিন্তু রনবীর ক্ষেত্রে আমরা এর ব্যতিক্রম দেখতে পাই। কেননা সন্ত্রাস, রাজনীতির কূটচাল বা অর্থনৈতিক অস্থিরতার প্রতি যেমন রনবীর কার্টুন আঙ্গুল তুলে কটাক্ষ করে ঠিক তেমনি নববর্ষ, ঈদ বা অন্য কোন উৎসবে মজার কিছু ক্যাপশনের মাধ্যমে জনসাধারণকে শুভেচ্ছা জানায়। অর্থাৎ তিনি একটি মাত্র খুটিকে আঁকড়ে ধরে থাকেন নি কখনই। তাই বলা যায় রনবীর আঁকা কার্টুন বহন করে বাণী, যে বাণী প্রয়োজনীয় সময় এবং সময়ের মানুষের জন্য।

কার্টুনের মূল লক্ষ্য হল সূক্ষ্ম রসবোধের মোড়কে প্রয়োজনীয় কথা বলা। হাস্যরসের প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজাত। তাই কার্টুনের মাধ্যমে যে কথা বলা হয় তা মানুষ সহজেই আত্নস্থ করে নিতে পারে। এভাবেই রনবীর কার্টুন সচেতনতা সৃষ্টি করতে সহায়তা করে। বৈচিত্র্যময় ও ব্যতিক্রমধর্মী পরিবেশনার কারণে রনবীর কার্টুন পাঠকের কাছে গুরুত্ব বহন করে। কার্টুন অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে সূক্ষ্মরসবোধের আবরণে পাঠকের

Dhaka University Institutional Repository

হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে দিতে চায়। অতীত,বর্তমান ও ভবিষ্যতের মানুষ তাদের জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী পাঠকের কাছে সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয়।

প্রতিদিন-প্রতিক্ষন পরিবর্তন। সমাজ, রাজনীতি অর্থনীতি কোন কিছুই বাদ যাচেছনা । নব থেকে নবতর হচেছ প্রতিদিনের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি। বাড়ছে সামাজিক অস্থিরতা, প্রথাগত চাপ। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিও সামাজিক অনাচার, কুসংস্কার থেকে সরিয়ে আনতে পারছেনা । তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা বঞ্চিত শ্রেনীর মানুষকে উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত না করতে পারার ফলে আরোও দ্রুত বাড়ছে অর্থনৈতিক বৈষম্য। নীতিহীন রাজনীতি ধ্বংস করে দেয় সহযোগিতা ও সহনশীলতার চিরায়ত সীমারেখা। এই ভঙ্গুর সমাজ, নষ্ট রাজনীতি ও ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতির বিভিন্ন পরিবর্তন রনবীর কার্টুন তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক অনাচার ও দায়িত্বহীনতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক অসততা, দূর্নীতি ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি নানা ঘটনাসহ বিবেক বর্জিত কোন কর্মকান্ডই দেশের জনসাধারণের জন্য মোটেও প্রীতিকর নয়। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে কিছু আশাপ্রদ ঘটনাও যে ঘটে না তা নয়। রনবীর কার্টুন তীক্ষ্ম চোখে এসব ঘটনার সমালোচনা করে এবং এভাবেই কোন ব্যাপারটি জনগণের জন্য ভাল ও মন্দ তার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনে দেয় গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে।

সময়ের সাহসী মানুষ হিসাবে যেভাবে কথা বলা দরকার সেভাবেই কথা বলেছেন তিনি তার কার্টুনের মাধ্যমে।তিনি যখন থেকে কার্টুন আঁকতে শুরু করেন, তখন ধ্রুপদ ধারার চিত্রকর্মের মত কার্টুনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও শৈল্পিক কদর ছিল না। তারপরও তিনি এঁকে গেছেন কার্টুন- চরম ধৈয্য নিয়ে- পরম মমতা নিয়ে। এ মমতা দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি। সামাজিক অবক্ষয় ও অস্থিরতা প্রশাসনিক দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, রাজনৈতিক অসততা, অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্য ইত্যাদি থেকে শুরু করে মশার উপদ্রব কোন কিছুই রেহাই পায়নি তার হাতের শৈল্পিক আঁচড় থেকে। তিনি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন সমাজপতি ও রাজনীতিবিদদের আসল চেহারা। আর তাইতো কার্টুন হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের সরব মুখপাত্র। তিনি সমাজকে ভাঙ্গতে চান না, কেবলই চান নাড়া দিতে। পোড়

Dhaka University Institutional Repository

খাওয়া মানুষ তিনি। বুঝেন নতুন সমাজের দিকে নিয়ে যাওয়ার মত নেতৃত্বের অভাব। তাইতো ঝুঁকি নিতে নারাজ। সমাজ ও রাজনীতিকে মৃদু মৃদু ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দিতে চান। অর্থ ও রাষ্ট্র যন্ত্র দুটোকেই শক্তিশালী বলে জানেন। তবে কার্টুনকে এদের চেয়ে দূর্বল ভাবতে চান না। বরং অধিকতর শক্তিশালী মনে করেন। সে কারণে তিনি সমাজ ও রাজনীতির জন্য প্রয়োজনীয় মেসেজ পৌঁছে দিতে চান কার্টুনের মাধ্যমে।

রনবীর কার্টুনের বিষয়গুলিই বলে দেয় তিনি সময়কে পাশ কাটিয়ে চলতে পারেন না। এড়িয়ে যেতে পারেন না - সময়ের সাথে বয়ে চলা মানুষ, তাদের সমাজ, রাষ্ট্রযন্ত্র, রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতি। আর তাই তাঁর কার্টুনের সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আমাদের দেশের কার্টুনশিল্পীদের মাঝে রনবীর শিল্পস্বত্ত্বায় যে গভীর মননশীলতা, শৈল্পিক সূক্ষ্ম বোধ ও পারিপার্শ্বিক বাস্তব অনুভূতির প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়- সেসব বিচারে তিনি যথার্থ একজন দেশপ্রেমিক ও প্রথিত যশা খাঁটি সার্থক শিল্পী। অপরদিকে আধুনিক চেতনাবোধ সমৃদ্ধ ও ও নির্ভেজাল জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত তাঁর শিল্প নির্মাণের ধারাকে আমরা সদা সতর্ক দৃষ্টি সম্পন্ন সচেতন একজন নাবিকের সাথে তুলনা করতে পারি। সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি আর প্রতিনিয়ত সাবধানতার সর্তক সংকেত দিয়ে তিনি তাঁর অগ্রসরতার চলমান গতি বজায় রেখেছেন। তিনি তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সমাজ কাঠামো ও অর্থনীতির গতিধারা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর স্থায়িত্ব ও ক্রমাবিকাশের ধারাবাহিকতাকে সুদৃঢ় কাঠামোর উপর স্থাপন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

দেশের যেকোন ক্রান্তি লগ্নেই তার কলম থাকে সমান ক্ষুরধার। সেই প্রেক্ষিতে একথা নিঃসঙ্কোচিত্তে বলা চলে যে বাংলাদেশের কার্টুনকে রনবী একই একাই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন বহু বছর। বস্তুত রনবীর কার্টুনের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি উক্তি আমাদেরকে বিবেকের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে বাধ্য হই- কি করছি আমরা। কোথায় নিয়ে চলেছি আমরা আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে। এভাবে অনেক সময় নিজ প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে আমরা নিজেদের শুধরে নেই। সমাধান হয় অনেক সমস্যার আবার অনেক ক্ষেত্রে হয়তো ঘুনে ধরা এই সমাজ ব্যবস্থা ব্যস্ততার অজুহাতে এই সব প্রশ্নকে এড়িয়ে যায় সুকৌশলে; সমস্যার আর সমাধান হয় না। কিন্তু রনবী থেমে থাকেন না। অবিচল এক সৈনিকের মতো তিনি তাঁর কলম নামক অস্ত্রের সাহায্যে আমারে চারপাশে গড়ে উঠা অন্যায়-অবিচারের দেয়ালে আঘাত হেনে চলেন বারংবার।

রনবীর কার্টুনকে গভীর ভাবে অনুভব করলে আমরা দেখতে পাই সমাজের উচুঁ নিচুর পার্থক্য ও ভেদাভেদ তথা শ্রেণী বৈষম্যের যে ধারা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অব্যাহত রয়েছে মূলতঃ তার সম্পর্কে অঙ্গুলী নির্দেশ করেই তিনি তুলি চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিনিয়ত

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক অবক্ষয় ও অবব্স্থা দৃষ্টে তিনি যেভাবে আহত হন তার প্রতিটি রক্ত কণিকায় সৃষ্ট আখরের ভাষা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই কার্টুনিষ্ট রনবী শুধু মাত্র শিল্পীর তুলি হাতেই দাঁড়িয়ে নেই, শিল্প কর্মের পারঙ্গময়তার পথ ধরে অনেক পথ অতিক্রম করে মানবিক বোধ সম্পন্ন একজন সমাজ সংস্কারক হিসেবে অপর হাতে জ্বলন্ত মশাল ধারণ করে জনতার সারির অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে তিনি নতুন বারতার আহবান জানান। আমরা এখানে তাকে মহান শিল্পীর ধারক ও বাহক হিসেবে নির্দ্বিধায় স্বীকৃতি দান করতে পারি।

আমাদের সমাজ জীবনে অবক্ষয়ের মাত্রা এমন পর্যায়ে এসে দাড়িঁয়েছে যে এখানে কেউ কাউকে মেনে চলার কিংবা তার কাউকে অনুসরণ করার মানসিকতা পর্যন্ত দিন দিন পরিত্যাজ্য হচ্ছে। কোন সংশোধনের আদর্শ কিংবা পরিশুদ্ধের পদ্ধতি কিছুই আর কার্যকরী হচ্ছে না। এখানে পরিবেশ পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে কেউ কাউকে আর আইনের মাধ্যমে কিংবা বল প্রয়োগ করে সংশোধন করতে পারছেনা। এমতাবস্থায় কার্টুনের কৌশলগত প্রয়োগ সমাজের একেবারে নিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চ ব্যক্তিকে পর্যন্ত সমালোচনা, সতর্ক কিংবা সংশোধন হওয়ার সংকেত দিতে পারে। ব্যংগচিত্রের ইঙ্গিতময় কৌতুক রেখার আড়ালে সত্য কথনের শাসনটি সমাজ গড়ার কাজে নেহাত কর্ম কার্যকর নয়। এই পরিস্থিতিতে রনবীর মত একজন সচেতন শিল্পীর হাতের তুলি যুগোপযোগী এ ব্যবস্থা কার্যকর করার মাধ্যমে দেশ ও জাতির অশেষ কল্যাণ বয়ে আনছে।

কার্টুন নিছক কার্টুন নয়। এর গভীরতা এবং তাৎপর্য অনেক ব্যাপক ও বহুমুখী। সমাসাময়িক কালে এর প্রয়োগ ও উপযোগিতা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজ জীবনে সংস্কারমূলক কার্যবিধি পরিবর্তন সাধনে এর প্রতিক্রিয়া বিস্ময়কর ফল আনয়ন করে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এখন জাতীয় জীবনের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের একান্ত প্রয়োজন অর্থনৈতকি মুক্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে সবাই হয়ে পড়েছে দ্বিধাগ্রস্থ। যুগে যুগে মহান ব্যক্তিত্বের অধিকার জন্য সেবকদের আবিভাব যেভাবে দেশ ও জাতিকে মুক্তি আলোকে

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ভাসিত করে, তেমনি রনবীর কার্টুন তথা কার্টুন চর্চা ও প্রয়োগ হয়তবা একদিন আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মাইল ফলক হিসাবে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এবং কামনা মোটেই অমূলক নয়।

রনবীর কার্টুনে বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির সত্যিকার যে প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জাতীয় জীবনে যুগোপযোগী ও ফলপ্রসূ অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারা ও কর্ম আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে অম্লান হয়ে থাকবে।

রনবীর মত একজন গুণী শিল্পীর পদচারণায় আমাদের সমাজ কাঠামো ও শিল্প প্রাঙ্গণ সমৃদ্ধ হয়েছে বহুগুণে। তিনি আরো বহুবার আমাদের মাঝে থেকে তাঁর অসামান্য শিল্পকর্ম আমাদেরকে একের পর এক উপহার দিয়ে চলুন এটাই আমাদের সকলের ঐকান্তিক কামনা।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১. গ্রন্থঃ

অতুল চন্দ্র রায়- ভারতের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড), কলিকাতা, ১৯৮৭

অরুপরাহী (সম্পাদক)- সিভিল সোসাইটি রাজনৈতিক পর্যালোচনা, জনান্তিক, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯

আজিজুর রহমান খান ও অন্যান্য (সম্পাদক)- শিল্পায়ন ও উন্নয়ন বাংলাদেশ প্রেক্ষিত- প্যানোরমা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৯৭

আজিজুর রহমান মল্লিক (সম্পাদক)- 'রক্তাক্ত বাংলা' মুক্তধারা, কলকাতা, আগষ্ট, ১৯৭১

আতিউর রহমান ও সৈয়দ হাসেমী-
ভাষা আন্দোলনঃ অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণী অবস্থান
দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৯০

আবদুর রহিম ও অন্যান্য- বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৮৭

আবদুল মতিন / আহমেদ রফিক- ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাপর্য
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২ ফেব্রুয়ারী

এ্যাগনিস এ্যালেন- ইউরোপের চিত্রকলা
ভাষান্তরঃ কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ২০০০।

এ বড়াল, সাধারণ জ্ঞান, বড়াল প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৮

এম.এইচ. আলী (সম্পাদক)- সেলফ অ্যাসেসমেন্ট,
বি.সি.এস. গাইড-মিলারস প্রকাশনী, ঢাকা মে ১৯৯৮

তারেক শামসুর রহমান- বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি,
উত্তরণ, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০০০।

বদরুদ্দীন উমর- নির্বাচিত প্রবন্ধ, অন্যপ্রকাশ,
একুশের বইমেলা, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

রতন তনু ঘোষ- স্বদেশ, সমাজ, সাহিত্য- মুক্তশ্রী প্রকাশন,
ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ২০০০।

রনবী- টোকাই (তিনটি গ্রন্থ)- প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা,
ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪।

রেহমান সোবহান- বাংলাদেশের অভ্যুদয়,
একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য, ঢাকা-১৯৯৪

রংগলাল সেন- সামাজিক স্তর বিন্যাস- বাংলা একাডেমী,
ডিসেম্বর, ১৯৮৫।

শহিদুল ইসলাম-জাতীয়তাবাদঃ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি
শিক্ষাবার্তা, ফেব্রুয়ারী, ২০০০।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রথম খন্ড),
ঢাকা-১৯৯৩।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী- আশির দশকে বাংলাদেশের সমাজ
ভানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন- বাঙ্গালীর প্রণোদনা
সাহিত্য ও সংস্কৃতি- আহমেদ পাবলিশিং হাউস,
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯।

সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, কাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক)
বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিঃ ধর্ম- সাম্প্রদায়িকতার সংকট
জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯।

সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম- স্নাতক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, হাসান বুক হাউস ঢাকা,
জানুয়ারী, ১৯৮৭।

Encyclopeadia Britanica- Volume 2.15

Macmilan- *Anthropological Dictionary*

R.A. Hudson- Linguistic and Social Inequality

Dhaka University Institutional Repository

২. সহায়ক পত্র-পত্রিকা (ঢাকা থেকে প্রকাশিত)

'আজকের কাগজ'

কার্টুন ম্যাগাজিন- 'নিরীক্ষা'

'দৈনিক ইত্তেফাক'

'দৈনিক জনকণ্ঠ'

'দৈনিক দিনকাল'

'দৈনিক প্রথম আলো'

'দৈনিক বাংলা'

দৈনিক ভোরের কাগজ'

'পূর্ণিমা'

'ফোরাম'

'বিচিত্রা'

'মানব জমিন'

'সন্ধানী'

'সাপ্তাহিক প্যানোরমা'